মানববিদ্যা গবেষণাপত্র ॥ পঞ্চম সংখ্যা ॥ আষাঢ় ১৪২৮ ॥ জুলাই ২০২১ ॥ ISSN 2518-5853
কলা অনুষদ ॥ জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়, ত্রিশাল, ময়মনসিংহ, বাংলাদেশ

ইতিহাসের আলোয় দেশভাগ ও সমরেশ বসুর দুটি উপন্যাস

রেজওয়ানা আবেদীন*

গবেষণা-সারসংক্ষেপ: দেশভাগ বাঙালি মানসের এক গভীর ক্ষতের নাম। যার ফল এক বঙ্গের দুই রূপ: পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গ। পূর্ববঙ্গে জন্মগ্রহণ করে সমরেশ বসু জীবনের পরিক্রমায় বসতি স্থাপন করেছিলেন পশ্চিমবঙ্গে। *সওদাগর* (১৯৫৬) ও *খণ্ডিতা* (১৯৮৭) উপন্যাস দুটিতে লেখকের স্মৃতি ও সত্তায় তাঁর জন্মস্থান বাংলাদেশ যেন জলজ উদ্ভিদের মতো শেকড় ছড়িয়ে জেগে আছে। উপন্যাসদ্বয়ের নায়ক চরিত্রের মতোই জীবিকার নির্মম তাগিদে লেখককেও অতিক্রম করতে হয়েছিল দুঃসহ পথ, হতে হয়েছিল উদ্বাস্তু। দেশভাগকে উপজীব্য করে সৃষ্ট উপন্যাসদুটিতে ইতিহাসের এই গভীর ক্ষতকেই ধারণ করতে চেয়েছেন লেখক। আলোচ্য প্রবন্ধে পাঠ-বিশ্লেষণ পদ্ধতিতে *সওদাগর* ও *খণ্ডিতা* উপন্যাসে বিধৃত দেশভাগের অবর্ণনীয় দুর্ভোগ এবং ঔপন্যাসিকের জন্মস্থানের স্মৃতির স্বরূপ ও তাৎপর্য তুলে ধরা হয়েছে।

যে-কোনো লেখক, তা তিনি যে কালেরই হোন না কেন, স্বদেশ তথা পারিপার্শ্বিকতা তাঁর সাহিত্যকমর্কে প্রভাবিত করে। লেখক সমরেশ বসুর (১৯২৮-১৯৮৮) ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। বাংলাদেশে তাঁর জন্ম। বাংলাদেশের আলো-বাতাসে তিনি শৈশব কাটিয়েছেন। কিন্তু আমৃত্যু ছিলেন ভারতবাসী। তিনি এই দুইটি দেশের শিক্ষা, সভ্যতা, সংস্কৃতি, ইতিহাস, ধর্ম, মানুষ ও কালকে ধারণ করে লেখায় বৈচিত্র্যপূর্ণ বিষয় ও বহুমাত্রিক চরিত্রের উপস্থাপন ঘটিয়ে শিল্পের জগতে হয়ে উঠেছেন সর্বভারতীয়। সর্বভারতীয় হয়ে ওঠার পথটাকে সাবলীল করার ক্ষেত্রে সমরেশ বসুর স্বকাল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

* সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, সাভার, ঢাকা, বাংলাদেশ।

উনিশশো সাতচল্লিশ সালে ভাগের ফলে সৃষ্টি হয়, পাঞ্জাব ও বাংলা। এই খণ্ডনের খাঁড়ায় বলি হয় লক্ষ লক্ষ মানুষ– হিন্দু, মুসলিম, শিখ। পাঞ্জাবের দাঙ্গা ও দেশবিভাগের কাহিনী শুনিয়েছে ভীষ্ম সাহানি, কৃষণ চন্দর, সাদাত হোসেন মান্টো, ইসমত চুঘতাই, খুশবন্ত সিং প্রমুখ লেখক। দেশভাগের মতো ঐতিহাসিক এই বিষয়টিকে নিয়ে ভারতবর্ষের অন্যত্রও লেখালেখি কম হয়নি। বাংলা সাহিত্যে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯৪৬ সালের দাঙ্গাকে উপজীব্য করে লিখলেন উপন্যাস, *স্বাধীনতার স্বাদ* (১৯৪৯)। এছাড়া পূর্ববঙ্গত্যাগী উদ্বাস্তুদের জীবনসংগ্রামের কথা লিখলেন *সার্বজনীন-এ* (১৯৫২)। 'অমরেন্দ্রনাথ ঘোষের *ভাঙছে শুধু ভাঙছে* (১৯৫১) দেশভাগ ও দেশত্যাগ বিষয়কেন্দ্রিক সার্থক বাংলা উপন্যাস।' (তারক সরকার ২০০৯: ৩৫)। পূর্ববঙ্গের গ্রামজীবন, হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতি, দেশভাগ, পশ্চিমবঙ্গে আগত উদ্বাস্তুদের ক্যাম্পে অমানবিক জীবনযাপন আবেগময় ও অসাম্প্রদায়িক চেতনায় বর্ণিত হয়েছে উপন্যাসটিতে। এ লেখক *ঠিকানা বদল* (১৯৫০) ও *বেআইনি জনতা* (১৯৫১) নামে আরও দুটি উপন্যাস লিখেছেন যথাক্রমে উদ্বাস্তুদের জীবন সংগ্রাম এবং সংখ্যালঘু মুসলমান ও দেশত্যাগী হিন্দুদের আশ্রয় খোঁজার কাহিনী নিয়ে। রমেশচন্দ্র সেন *পুব থেকে পশ্চিমে* (১৯৫৬) দেশভাগ, দেশত্যাগ ও রিফ্যুজিদের ক্যাম্পজীবন ও পশ্চিমবঙ্গে উপনিবেশ স্থাপনের অনুপুঙ্খ বিবরণ দিয়েছেন। এছাড়া অজিত দাসের *ভাগফল* (১৯৫৬), অমিয়ভূষণ মজুমদারের *গড় শ্রীখণ্ড* (১৯৫৭), অসীম রায়ের চারটি উপন্যাস—*একালের কথা* (১৯৫৫), *দ্বিতীয় জন্ম* (১৯৫৬), *দেশদ্রোহী* (১৯৬৬), *শব্দের খাঁচায়* (১৯৬৮)-এ দেশভাগ প্রসঙ্গ এসেছে নানাভাবে। *বকুলতলার ক্যাম্প* (১৯৭৮), *বাল্মীক* (১৯৮৩) ও *অরণ্যদণ্ডক* (পূর্বনাম *নৈমিষারণ্য*, ১৯৮৪)- নামে একই পটভূমিতে বৈচিত্র্যময় দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে উপন্যাস তিনটি নারায়ণ স্যানাল লিখেছেন। দেশভাগ, দেশত্যাগ ও পরবর্তী প্রভাব নিয়ে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছেন *অর্জুন* (১৯৭১) ও *পূর্বপশ্চিম* (১৯৮৮) উপন্যাস দুটি। অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন *নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে* (১৯৭১) ও *মানুষের ঘরবাড়ি* (১৯৭৮)। গৌরকিশোর ঘোষ *দেশমাটি ও মানুষ* শিরোনামের এপিক ট্রিলজিতে দেখালেন বাঙালি মুসলমানের আত্মানুসন্ধানের স্বরূপ। ট্রিলজির তিনটি উপন্যাস, *জল পড়ে পাতা নড়ে* (১৯৭৮), *প্রেম নেই* (১৯৮১) ও *প্রতিবেশী* (১৯৯২)-তে ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে লেখক বিশ্লেষণ করতে চাইলেন হিন্দু-মুসলমানের ক্রমবিচ্ছিন্নতার ইতিবৃত্ত।

***সওদাগর*: অন্ত্যজ হয়ে ওঠা এক সওদাগরের আলেখ্য**

সওদাগর উপন্যাসটি ১৯৫৬ সালে প্রকাশিত। ১৯৪৭ সালের জুলাই মাস থেকে ১৯৪৮-এর প্রায় মাঝামাঝি পর্যন্ত উপন্যাসের ব্যাপ্তি। প্রায় এক বছরব্যাপী সময়ে রয়েছে নানা উত্থান-পতন। যুদ্ধোত্তর পটে উপন্যাসটির কাহিনী শুরু। শিল্পাঞ্চলভিত্তিক শ্রমজীবী মানুষদের কেন্দ্রে রেখে উপন্যাসটির বিস্তার ঘটেছে। কাহিনীর কেন্দ্রে রয়েছে সাধারণ নিম্নজীবী মানুষের অর্থনৈতিক সংকট। প্রধান চরিত্র মেঘনাদ দাসের ছেলেবেলা থেকে মধ্যবয়স অব্দি জীবনের নানা টানাপড়েন খণ্ড খণ্ড চিত্ররূপে উপস্থাপিত হয়েছে

সওদাগরে। তিনটি অধ্যায়ে বিভাজিত উপন্যাসটির প্রথম অধ্যায়, "ফেলে আসা দিন", মেঘনাদের বাল্যকালের স্মৃতিচারণ এ অংশের মূল বিষয়। দ্বিতীয় অধ্যায় "নয়া বাড়ি", সর্বহারা মেঘনাদের নতুন জীবনযুদ্ধের প্রস্তুতিপর্ব ও শেষ অধ্যায় "দিকশূল"[১], যেখানে সর্বস্বান্ত মেঘনাদ আবার নবরূপে যুদ্ধরত।

উপন্যাসটি সম্পর্কে সমালোচক বলেছিলেন, "সবচেয়ে বড় কথা মানুষের যে অপরাজেয় বলদৃপ্ত পৌরুষের কথা সমরেশের একটি প্রিয় প্রসঙ্গ, তার বিশ্বস্ত বিবরণ আছে।" (বসু ১৯৮৬: ১৮৫) উপন্যাসটির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গ, দেশবিভাগোত্তর পূর্ব থেকে পশ্চিম পকিস্তান ও পশ্চিম থেকে পূর্ব পাকিস্তানমুখী রিফিউজি মানুষের সঙ্কট। উদ্বাস্তু সমস্যা নিয়ে ইতোপূর্বে লিখেছিলেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় *সার্বজনীন* ও *পাশাপাশি*, বনফুল লিখেছিলেন *পঞ্চপর্ব* ও *ত্রিবর্ণ*, নরেন্দ্রনাথ মিত্র লিখেছেন, *উপনগরে*র মতো উপন্যাস। সমরেশ বসু *সওদাগরে* উদ্বাস্তু সমস্যাকে মূল প্রেক্ষণবিন্দু করেননি। তবে পটভূমির সূচনা হয়েছে দেশবিভাগোত্তর আশ্রয়হীন মানুষদের সামনে নিয়েই।

মেঘনাদ *সওদাগর* উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র। মদন দাসের ছেলে মেঘনাদ বংশীয়ভাবে ধর্মে গোঁড়া বৈষ্ণব। জাতে ও পেশায় খাঁটি ব্যবসাদার সাহা। ছেলেবেলার স্মৃতি রোমন্থন করতে গিয়ে সৎমায়ের সংসারে নাটাই ব্রতর[২] কথা মনে পড়ে মেঘুর,

> [...] দ্বিতীয় পক্ষের বউ ঘরে, প্রথম সতীনের ছেলেমেয়েগুলিকে দূর দূর করে। নিজের বেটা বেটি নিয়ে পিঠা-পায়েসে চাকুম-চুকুম, সোনা গহনার ঝকর-মকর, চুবচুবে তেলে নাকন-চিকন...নাটাই চণ্ডীর ব্রতকথা মনে পড়ছে তার। (বসু ২০০০: ১১৯)

প্রথমে মা পরে বাবা হারানো মেঘু কপর্দকশূন্য হয়ে মানুষের দ্বারে দ্বারে ঘুরে বেড়িয়েছে:

> মায়ের মুখ মনে পড়ে না ছেলের। মাথা না থাকলে মাথা ব্যথা হয় না। মাতৃ-স্নেহ বঞ্চিত সে। যা পায়নি, স্বাদ জানা নেই, তার জন্য সে কাঁদেনি কোনওদিন। বাপের জন্যও সে কাঁদল না। কাঁদল না নয়, কান্না এল না। দুশ্চিন্তায় কুঁকড়ে উঠল সে। কচি প্রাণ পাথর হয়ে উঠল ভাবনায়। (বসু ২০০০: ২৫)

সহায়-সম্বলহীন মেঘু সাহাদের ঘরের এক কলঙ্কিত শিশু। কারণ ব্যবসা-বাণিজ্যবিহীন সাহাগৃহ এক বিরাট ব্যতিক্রম,

> [...] কিছু না থাক সাহার ঘরে টাকা থাকে কিছু। 'বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী' এই হলো অধিকাংশ সাহার নেশা ও পেশা। অন্তত মেঘনাদ তাই দেখেছে তাদের গ্রামে। ধর্মে গোঁড়া বৈষ্ণব, জাতে ও পেশায় খাঁটি ব্যবসাদার। (বসু ২০০০: ২৩-২৪)

---

[১] দিকশূল অর্থ, গ্রহ-নক্ষত্রের অশুভ অবস্থানজনিত কোনো বিশেষ দিকে গমনে নিষিদ্ধ দিন। (শৈলেন্দ্র বিশ্বাস ২০০৫: ২৮৬)

[২] প্রতি বছর অগ্রহায়ণ মাসের কয়েকটি রবিবারে নাটাই পূজা করা হয়। বিশেষ ধরনের পিঠা-পায়েস তৈরি করা হয় এ সময়। (যতীন্দ্রনাথ রায় ২০১৬: ২৭৪)

"প্রত্যক্ষত ধনপতি সওদাগর অর্থাৎ চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের ব্রতকথার লৌকিক পরম্পরাকে সমরেশ বসু ব্যবহার করেছেন। কিন্তু প্রচ্ছন্নে মনসামঙ্গলের চাঁদ বেনের কাহিনীর একটি নতুন প্রতিফলনও লক্ষ্য করা যায়।" (বন্দ্যোপাধ্যায় ২০১০: ৬১-৬২) মেঘনাদের ভাবনায়, "এসেছে অন্ধকারের বুকে আচমকা প্রাণহারিণী কালসাপিণীর মত।" (বসু ২০০০: ১) সাপের চিত্রকল্পটিতে মনসামঙ্গলের কাহিনীর ছায়া আছে।

ঋণ শোধ করতে না পেরে সর্বস্বান্ত তার বাবা যার কাছ থেকে মূলধন নিয়েছিল শিশু মেঘু সেই লক্ষ্মণ সা'র গদিতে চাকর হয়ে, স্বপ্নে বিভোর থাকে ধনপতি সওদাগর হওয়ার,

> আশা মরে না। রক্তের মধ্যে তার বাণিজ্যের ডাক। ভেতরে ভেতরে তার সেই প্রবল বাসনাই মাঝে মাঝে তাকে ক্ষুব্ধ করে তোলে, ধিক্কৃত করে। সে কারবার করবে। ঘুনসিতে চাবি বেঁধে বসবে গদিতে। হবে মস্ত মহাজন। (বসু ২০০০: ২৬)

এ প্রসঙ্গে মনে পড়ে যায় *পদ্মপুরাণে*র চাঁদ সওদাগরের চৌদ্দ ডিঙ্গা নিয়ে যাত্রার সূচনাংশ:

> একে একে পূজিলেক দেব দিবাকর।
> নানা বাদ্য বাজে তাহে শুনি মনোহর ॥
> পদ্মাবতী না পূজিল সাধুর কুমার।
> মনে মনে পদ্মাবতী ভাবি কৈল সার ॥
> নানা বাদ্য বাজে আর মঙ্গল মালসি।
> দেবতার পদে সাধু মাগিল মেলানি ॥
> যার যার চরণ ডিঙ্গা চড়ে সেই জন নায়ে।
> মনে সার করি সাধু পাটনে[তে] যায়ে ॥
> চৌদ্দ নায়ে ভরা ভরে করে পরিপাটি।
> তোল পাল করি যায় চম্পকের মাটি ॥ (গুপ্ত ১৯৬২: ২৪১)

শরীরে প্রবহমান সাহা বংশের রক্তের গুণেই শিশুকাল থেকে সে স্বপ্ন দেখেছে মস্ত বড় ব্যবসায়ী হওয়ার। কিন্তু তার জীবন শুরু হলো লক্ষ্মণ সা'র গদিতে চাকর হিসেবে। আশা ছিল, ভবিষ্যতে ব্যবসার কাজকর্ম শেখাবে লক্ষ্মণ সা। কাজকর্ম বুঝতে পারলে, গুরুত্বপূর্ণ কাজের দায়িত্ব দিয়ে পাঠাবে দেশ-দেশান্তরে। কিন্তু তা ছিল কেবলই আশার গুঁড়ে বালি। খুব অল্পদিনেই বাড়ির সকলের ফাইফরমাস খাটা অপরিহার্য চাকরটি বিতাড়িত হয়েছিল ভণ্ড গণকের বিচারে চোর সাব্যস্ত হয়ে। প্রতিনিয়ত বিরূপ পরিস্থিতি মোকাবিলা করেও আশাহত হয়নি কখনোই মেঘু। উপন্যাসে পূর্বাপর লোকপুরাণ প্রসঙ্গ ঘুরেফিরে এসেছে। সমরেশ বসুর উত্থাপিত *মনসামঙ্গলে*র লোককথার চাঁদ সওদাগর প্রসঙ্গে সমালোচক বলেছেন:

> সমস্ত 'সওদাগর' উপন্যাসে এই লোকপুরাণের প্রত্নপ্রতিমা কমবেশি কার্যকর থেকেছে। যেহেতু এটা উপন্যাস, সেই হেতু সমরেশ লোকপুরাণ ব্যবহারে কিছু স্বাধীনতা নিয়েছেন। তাঁর পরিকল্পনায় বিপর্যস্ত অথচ সংগ্রামী চাঁদ সওদাগর এবং ভাগ্যবিড়ম্বিত ধনপতি সওদাগর

> মিলেমিশে গেছে। প্রত্নপ্রতিমাটিকে সমরেশ উপন্যাসের উপরিতলে নিয়ে আসতে চাননি। তাঁর সজাগ পরিকল্পনা সহস্র প্রতিকূলতার সঙ্গে সংগ্রামরত নব ভারতের এক অদম্য শিল্পোদ্যোগীর প্রতিমা রচনার দায়িত্বে দৃঢ়। (বন্দ্যোপাধ্যায় ২০০০: ভূমিকা)

ব্যবসা-বাণিজ্য নেই যে সাহার ঘরে তাদের কলঙ্কিত বলা হয়। মেঘনাদ কলঙ্কিত সাহার ঘরের ছেলে হওয়ায় সমাজের উচ্চস্থানে আসীন ব্যবসায়ী, যার কাছে মদন দাসের সকল বিষয়-সম্পদ বাজেয়াপ্ত, তার কাছেও সে কলঙ্কিত। গণকের রায়ে সে রাহুগ্রস্ত। কিন্তু শরীরে যে বংশের রক্তের ধারা প্রবহমান, তার গুণেই মেঘু ছোটবেলা থেকেই স্বপ্ন দেখেছে তাকে গদি করতে হবে। সিন্দুকভর্তি টাকা থাকবে তার। সে ধনপতি সওদাগর হবে। এ প্রসঙ্গে চাঁদ সওদাগরের প্রসঙ্গ এসেছে নানা জায়গায়:

> সপ্তডিঙা তার বদর বদর করে খাল নালা নদ নদী পেরিয়ে পাড়ি দেবে অকূল সমুদ্রে। পৃথিবী যেখানে শেষ সেখানে সেই রাবণ রাজার লঙ্কাতে গিয়ে ঠেকবে তার সপ্তডিঙ্গা নাও। পৃথিবীর হাটে হাটে বাণিজ্য করবে সে। কত দূর দূরান্তে যাবে। (বসু ২০০০: ২৫)

বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সপ্তডিঙা ভাসিয়ে ঘুরে বেড়ানো। দেশান্তরী হওয়ার স্বপ্ন আর দেখে না মেঘু, কিন্তু বংশের প্রবাহিত রক্তধারার মতো বড় ব্যবসায়ী হওয়ার স্বপ্ন দেখতে ভোলেনি। লাল মিয়ার সহায়তায় মেঘু হয়ে উঠেছিল বড় ব্যবসায়ী। কিন্তু দেশভাগের উত্তাল তরঙ্গে ইতি ঘটে তার ব্যবসার। তার চেতনায় পুনরায় দুলে ওঠে তার সপ্তডিঙা:

> ধনপতি সওদাগর। বদর ডিঙা যায়, শতকে বৈঠা ছপছপ পড়ে। সাত সাগরের জলে কেন মাটি ঠেকে যায় বৈঠায়। দ্যাখ দ্যাখ কী হল। জল নেই, সাত সাগর শুকিয়ে বালি। এ কার কোপ। মনসা জল শুষেছিল চান্দের, ধনপতির লক্ষ্মী। দেবীর কোপ পড়েছে। (বসু ২০০০: ১৮৬)

উপন্যাসে মেঘনাদের বয়স চল্লিশ, দৃশ্যত আরও অনেক বেশি।

> [...] সমরেশ মানুষটা নিজে তো ছোটখাটো। কিন্তু ওঁর চরিত্রের মধ্যে, উজ্জ্বল চরিত্র যেগুলো, বিলাস কী বিশাল মানুষ! বিরাট একটা লোক! ওই যে ওই মানুষটা যে 'বি. টি. রোডের ধারে'তে বস্তি চালায়, একটা দৈত্যের মতো চেহারা। (চৌধুরী ২০১৩: ৫৩)।

এই চরিত্রগুলোর সঙ্গে একই কাতারে দেখা যায় মেঘনাদকে, যার জীবনের পুরো সময় কেটেছে এখনকার বাংলাদেশ পূর্ববঙ্গে। ঢাকাকে কেন্দ্র করে তার জীবন। তাই বউয়ের শ্বশুরবাড়ি ফরিদপুর তার কাছে এক অজানা গন্তব্য, অনেক দূরের পথ। একমাত্র ভগ্নিপতি একদিকে অভাবগ্রস্ত, অন্যদিকে চরিত্রহীন। তাই পিতৃমাতৃহীন মেঘনাদ আশ্রয়হীন হয়েও 'ভগ্নীপতির পত্নীরূপী ক্রীতদাসী' দিদির কাছে যাওয়ার সাহস করেনি:

> তার চোখের জলে মেশানো নোনা ভাতে ভাগ বসাতে গেলেও সে বাড়ির লোকেরা তাকে দূর দূর করে তেড়ে আসবে। তার বোনাই, বনুই বলে যাকে ডাকে সে, সে আসবে তেড়ে মারতে। বাপ বেঁচে থাকতেই বোনের বাড়ির এ পরিচয় মিলেছে তার। তা ছাড়া দিদির মুখের গরাস মুখে নিতে পারবে না সে। (বসু ২০০০: ২৩)

ঢাকা থেকে যাত্রা করা এক মেল ট্রেনের যাত্রী মেঘনাদ দাস ও তার স্ত্রী লীলাবতী ওরফে ঝুমঝুমিকে অবলম্বন করে উপন্যাসের যাত্রা শুরু। জীবন-মরণের একমাত্র সম্বল শ'তিনেক টাকা নিয়ে সে আবার নিজ দেশে ফিরে যাওয়ার জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছিল। দেশভাগের ডামাডোলের মুখে সকলের উপদেশ অনুযায়ী মেঘনাদ লাল মিয়ার পর তার সবচেয়ে আস্থাভাজন বিপিনের হাতে ব্যবসার ভার বুঝিয়ে দিয়ে নতুন করে সবকিছু গড়ে তোলার আশায় চলে যায় কোলকাতার অদূরে তার শ্বশুরবাড়িতে, "মেঘু ভ্রূ কুঁচকে বলল, 'এ কী, চা? ও সব খাইনে। অতবড় বাবু এখনও হইনি। শত হলেও গেঁয়ো বাঙাল তো।'" (বসু ২০০০: ৭৪) চা খাওয়া মেঘুর কাছে বাবু হওয়ার শামিল, যা তার ছেলেবেলার সংস্কার। মেঘনাদের অভিপ্রায় ছিল, বিদেশি বিস্কুটকে দেশীয় স্বাদ দিয়ে এক মস্ত কারখানা স্থাপন করবে। এই কারখানা ছিল মেঘুর মন্দির, উপাসনালয়। দেশভাগের ডামাডোলে মেঘনাদের সেই বিস্কুট কারখানার জায়গায় স্থাপন হয় মন্দির। যা মেঘুর তিল তিল করে গড়ে তোলা সম্বল ছিল, সেই বিস্কুট কারখানার ইতি বারবার তাড়িয়ে ফিরেছে তাকে:

> তবু গলার স্বরটা চেপে এল তার। বলল, 'নেও দুটো, খাওয়া যাক।'
>
> নেওয়া হল। বিস্কুট মুখে দিয়ে হঠাৎ বুকের কাছে আটকে গেল মেঘুর। যদি আজ বিপিন দেখত। যদি তার কারখানার কেউ দেখত। ভূত দেখার মতো হয়তো চমকে উঠত। গলা দিয়ে যেতে চায় না। বুকের মধ্যে টন টন করে উঠল। শক্ত চোয়ালের দু পাশে আটকে রইল বিস্কুট। (বসু ২০০০: ৯১)

মেঘনাদের ব্যবসায়ের অবলম্বন মুন্সিগঞ্জের বিস্কুট কারখানার জীবনে তারই কর্মচারী বিপিন। যে শুধু একজন বেতনভুক শ্রমিক নয়, তার ভাল-মন্দ, সুখ-দুঃখের সঙ্গীও। বিপিন ছাড়া সে অনেকটাই ছন্নছাড়া। পরবর্তী সময়ে বিপিনকে সে পেয়েছে শ্যালক বিজয়ের মধ্যে:

> [...] বিজয় দেখল, একটা পাথরের মতো মুখ মেঘনাদের। তারপর আবার বলল সে, 'তবে একটা কথা। তোমার টাকা পয়সা সব সরিয়ে ফেলতে হবে,
>
> মেঘনাদ অবাক হয়ে বলল, 'কোথায়?'
>
> : পোস্ট অফিসে। খোলামেলা বস্তি বাড়ি। কখন কি হয় বলা তো যায় না। কিছু একটা হলে তখন মাথা কুটতে হবে।
>
> মেঘনাদ আর একবার দেখল বিজয়ের মুখের দিকে। যেন বিপিন কথা বলছে। বলল, 'আচ্ছা।' (বসু ২০০০: ৯৪)

অন্ত্যজ মানুষগুলো হাজার প্রতিকূলতার মধ্যেও নিজস্ব সংস্কৃতিকে আঁকড়ে থাকে। যদিও সাধ ও সাধ্যের সমন্বয় হয়ে ওঠে কষ্টকর। তাই লীলার ভাই বিজয় সপ্তাহান্তে যে আট টাকা পারিশ্রমিক পায়, সে-ই বোনাইয়ের আপ্যায়নের জন্য আস্ত এক ইলিশ কিনে বাড়ি ফেরে আড়াই টাকা সের দরে:

> কারবারি বোনাই এসেছে। ইলিশ মাছের মরশুমে তো বাজারে কাটা ইলিশের এক টুকরো ল্যাজা ছাড়া কিছু আসত না। ওইটুকু গন্ধ যদি বা হয়। আজ এনে ফেলেছে একটা। এ

> বছরের মরশুম তো শেষ। আর কী, শ্রাবণ মাস পড়ে গেছে। বড় জোর দু টাকায় নামবে, আর একদিন আনা যাবে তা হলে।
>
> বুক কাঁপছে সুকুমারীর। গলায় খুসখুস করে চুলকোচ্ছে। কিন্তু চিৎকার করে ঝগড়া আরম্ভ করতে পারছে না। শত হলেও মেয়ে-জামাই এসেছে এত দিন বাদে। কিন্তু হপ্তার টাকায় নিশ্চয় কম পড়বে। (বসু ২০০০: ৭৭)

বিজয়ের ইলিশ মাছ আনার খবরে নড়েচড়ে বসে নকুড়। মনোযোগ দিয়ে মাছ কাটা আর ভাগাভাগির কথা শুনছিল সে। পরম বৈষ্ণব হওয়ায় নকুড়ের বাপ মাছ খেত না। নকুড়ের সময় থেকে নিরামিষ খাওয়াটাই বিলাসিতার পর্যায়ভুক্ত হয়েছিল অভাবের তাড়নায়। তাও শুধু কচু, হিঞ্চে, কলমি শাক– যা বনেবাদাড়ে পাওয়া যায়। আলু, কপি, পটলজাতীয় তরকারি সোনাদুলির চরের মানুষ চোখে দেখে কম। খায় আরও কম, সেজন্য নগদ পয়সার দরকার। সিরাজদিঘার হাট না হলে তা পাওয়া মুশকিল। কচু হিঞ্চের সঙ্গে খালবিলের পুঁটি, মৌরালা, চিংড়ি কিংবা শোল, বোয়াল, সিং, কই মাছ পরম উপাদেয়। অভাব আর জিভের আস্বাদ:

> নকুড়ের বাপ থাকতে ওসব বাড়িতে ঢুকত না বড় একটা। ছেলেমেয়েরা ধরেছে কোঁচড় ভরে। পরের বাড়িতে দিয়ে এসেছে, কলাপাতায় করে রান্না মাছ নিয়ে এসেছে, লুকিয়ে খেয়েছে। নকুড়ও খেয়েছে, বাপ মরার পর অবাধ স্বাধীনতা। গলায় তুলসীর মালাটা ছিল, তাতে পুঁটি মৌরলার স্বাদ তেতো লাগেনি। আঁশের গন্ধে যে এত খিদে পায়, তা কে জানত। (বসু ২০০০: ৮০)

গণৎকার প্রসঙ্গ উপন্যাসে এসেছে বেশ কয়েকবার পরিহাসের বিষয় হিসেবে। যে কোনো সমস্যায় পড়লে সাহারা ছোটে গনকের কাছে। যে যা বলে, তাই করে দেয়। কী গদিতে কী অন্দরমহলে। কিন্তু দু বছর খাটার পর ঘটল আবার ভাগ্যবিপর্যয়। লক্ষ্মণ সাহার গদিতে হলো সামান্য ক্ষতি। এত সামান্য যে আকাশের কোটি নক্ষত্রের ভেতর থেকে একটি খসে পড়ার মতো দৃষ্টির অগোচর। কিন্তু তার জন্য ডাকা হলো গণক ঠাকুরকে। ক্ষতির কারণ অনুসন্ধানে জানা গেল:

> হয়েছে। পাওয়া গেছে ক্ষতির সন্ধান।
>
> রুদ্ধশ্বাসে প্রতীক্ষারত লক্ষ্মণ সা' চোখ বড় করে তাকিয়েছিল। তাকে গিয়ে কানে কানে বলল নসীরাম মদন সা'র অলক্ষ্মী ছায়া ঘুরছে তোমার গদিতে। সেই ছায়া হল মদনার ব্যাটা মেঘু। ওকে বিদায় কর। (বসু ২০০০: ২৭)

অতঃপর এক কাপড়ে বিদায় করা হয় মেঘুকে। বোঝা না বোঝার মাঝামাঝি দাঁড়িয়ে মেঘু থাকে নির্বোধের মতো। লক্ষ্মণ সাহার গদি থেকে উচ্ছেদ হয়ে মুন্সিগঞ্জে ছয়-সাত বছর থেকে নানা চড়াই-উৎরাই পার করে ঢাকার চকবাজারে বিস্কুট কারখানায় কাজ করে হাতেখড়ি নিয়েছিল। লালমিঞার সহায়তায় মেঘু যখন ভাল অবস্থান তৈরি করতে পেরেছিল, আবারো দেখা হয় ভণ্ড এই গণকের সঙ্গে। মেঘুর প্রতিপত্তির খোঁজ পেয়ে হতে চেয়েছিল আবারো সুযোগসন্ধানী,

> নসীরাম তাড়াতাড়ি বলল, 'নিশ্চয়ই যাবে। কিন্তু তোমাকে বাবা একটু শুচি হতে হবে। গদিটা শত হলেও অন্য জাতের ছিল। মাখামাখিও করছ। একটু পুজোটুজো দিয়ে শুদ্ধ করে নিতে হবে। আর তোমাকেও ফি বৈশাখে মঙ্গলচণ্ডীর– (বসু ২০০০: ৪১)

"বাংলাদেশে জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রতি মঙ্গলবার মঙ্গলচণ্ডীর ব্রত করা হয়। ঘটে দেবীর পূজা করে ব্রতকথা শোনা এবং চিঁড়ের ফলার খাওয়া রীতি।" (ভট্টাচার্য ১৯৮০: ২৩৫) এই নসীরামের কথায় মেঘু ভেবেছিল মঙ্গলচণ্ডীর ব্রত সে পালন করতে পারে তবে তা ঐ ভণ্ডের কথায় নয়। গণৎকারদের যে কোনো অলৌকিক ক্ষমতা রয়েছে তা নয়, বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই ধারণার উপর ভিত্তি করে অপেক্ষাকৃত দুর্বলের মাধ্যমে নিজের ক্ষমতার বহিঃপ্রকাশ ঘটাতে চায় তারা। নসীরাম গণক ঠাকুরও তাদেরই একজন। এই গণককে পরবর্তী সময়ে দেখা যায় রিফিউজি হয়ে কলকাতার পথের ধারে ভাগ্য গণনা করতে,

> [...] নসীরাম গণৎকার। বেঁচে আছে আজও! তিন মাথা এক হয়েছে। পাকাচুল যেন আবার কালচে হচ্ছে। বসেছে রাস্তার ধারে। পিজবোর্ডে লিখে রেখেছে, 'বাস্তুহারা গণৎকার, বিশিষ্ট হস্তরেখাবিদ। একবার পরীক্ষা প্রার্থনীয়। (বসু ২০০০: ১৮৬)

উপন্যাসে অলৌকিকতার প্রসঙ্গ এসেছে বারবার। মেঘুর যখন বয়স প্রায় পনেরো তখন সে লক্ষ্মণ সা'র গদি থেকে বিতাড়িত হয় ভণ্ড গণক নসিরামের গণনায় দোষী হয়ে। ছোট্ট সেই কিশোর অপমানে-দুঃখে এক ছুটে ধলেশ্বরী নদীর পাড়ে গিয়েছিল ডুবে মরার জন্য কিন্তু সেখানে এসে দাঁড়ায় তার মৃত বাবা। তাকে যেতে বলেছিল অনন্তির ঘাটে। গোয়ালাদের নৌকায় উঠে যাত্রা করতে বলেছিল,

> যেখানে তোর খুশি। এক জায়গা থেকে আর জায়গায়, দেশ হতে দেশান্তরে। যেমন করে ঘুরেছি আমি, তেমনি করে। সাহা ঘরের ছেলে তুই লক্ষ্মীর খোঁজ না করলে তোর পাপ হবে। সাহারা কেউ অলক্ষ্মীর ছেলে নয়। তুই যা। (বসু ২০০০: ৩০)

জীবনযুদ্ধে উত্তীর্ণ মেঘু প্রচণ্ড তেজোদীপ্ত শক্তির অধিকারী কাণ্ডারী হয়ে ওঠে লাল মিয়ার লাল বাতি জ্বলে যাওয়া ব্যবসাকে আবার বাঁচিয়ে তোলার জন্য। সফলও হয় সে। সারারাত কারখানায় কাজ করে আগের দিনের তৈরি মাল নিয়ে রাতে শহরে পৌঁছে দিতে যেত। যাত্রাপথে সঙ্গে থাকত কখনো কোনো কারিগর, কখনো সে একা:

> পথে তার বহু বিপদের সম্ভাবনা ওত পেতে থাকে। চোর ডাকাতের ভয়। ভয় হিংস্র জীব জানোয়ারের। তা ছাড়া অন্ধকার খাল বিলের বুকে বহু সহস্রবিধ অলৌকিক অদৃশ্য রহস্যজনক জীবদের আনাগোনা। মেঘু ভয় করে না। কিন্তু বিশ্বাস করে। বিশ্বাস করেও সে লড়বার জন্য প্রস্তুত। অপদেবতারা ফেরে নিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে। (বসু ২০০০: ৩৭)

পিতৃ-মাতৃহীন মেঘু যখন লক্ষ্মণ সা'র গদি থেকে বিতাড়িত হয়, তখন বিস্কুট কারখানার মালিক লাল মিয়া তাকে আশ্রয় দিয়েছিল। মেঘু তখন সে দেশ থেকে পালিয়ে বাঁচতে চেয়েছিল অসহ্য অপমান মাথায় নিয়ে। ১৯৪৭-এ দেশভাগের ঠিক আগে মেঘুর তিল তিল করে গড়ে তোলা ব্যবসা যখন আবার লাটে ওঠার আশঙ্কা দেখা দিল তখন ঢাকা থেকে মুন্সিগঞ্জ ফেরার পথে বুড়িগঙ্গার পাড়ে সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল মৃত লালমিঞা:

> বুড়িগঙ্গার জলে দেখল, লালমিঞ্‌া যেন ঢেউয়ে বসে নামাজ পড়ছে। দু'চোখে জল। নামাজ পড়ে কাছে এসে বলল, 'ভেবে কি হবে মেঘু। থেমে থাকিসনে। একবার থামলে সর্বনাশ। সাহেব যা বলেছে, তাই কর। বেরিয়ে পড়। দিন কখনও সমান যায় না। পথে অনেক কাঁটা। কিন্তু ভয় করলে তো চলবে না বাপ। আজ দেশ জুড়ে সবাই লালমিঞ্‌া হয়ে গেছে রে। সকলের সর্বনাশ, তোর একলার নয়। সাহা ঘরের ছেলে তুই। বেরিয়ে পড়, বেরিয়ে পড়।' (বসু ২০০০: ৫৬-৫৭)

এরপর আসে ১৯৪৬ সালের দাঙ্গা। এ সময় মেঘুর গদি কারখানা জ্বালিয়ে দেয়ার ষড়যন্ত্র হয়েছিল। কার্যকর হয়নি। মরেছিল মেঘুর দুজন কারিগর। এরপরই শোনা যায় হিন্দুস্থান ও পাকিস্তানের ভাগাভাগির কথা। এ সময়ে মেঘুর তিল তিল করে গড়ে তোলা বিস্কুট কারখানা শেষ হয়ে যাওয়ার শঙ্কা দেখা দেয়। শুভাকাঙ্ক্ষীরা উপদেশ দেয় মুন্সিগঞ্জ ছেড়ে কোলকাতার অদূরে গিয়ে নতুন করে ব্যবসা শুরু করার। বাধ্য হয়ে ব্যবসায় ইতি টানে মেঘু:

> রাজ্যহারা ছদ্মবেশী রাজার মতো সে এসে দাঁড়াল কারখানার সামনে। কারখানার ঢেউখেলানো টিনের বেড়ায় লেখা রয়েছে, মেঘনাদের রুটি বিস্কুটের কারখানা। নীচে, 'ঝুমির ঝুরি পাওয়া যায়। খাইতে মজা লাগে।' আরও নীচে, 'মেঘনাদের মালপোয়া, খাঁটি ছাড়া নয় ভুয়া'। তন্দুরে পোড়াবার কাঠ স্তূপীকৃত রয়েছে সামনেই, কালো অঙ্গারের ছাই জমেছে। [...] মেঘনাদ অথর্ব, শক্তিহীন, বোবা। কোনও এক ছেলে কাঁদবে তার ঝুমির ঝুরির জন্য। যেন সে এক কী বিচিত্র ব্যাপার। অর্থ বুঝল না। অনুভব হল না যেন কথাটির মর্ম। তবু কোনও ছেলের ট্যা ট্যা করে কান্না বাজতে লাগল তার বুকে। (বসু ২০০০: ৫৭-৫৮)

সেই লালমিঞ্‌াকেই মেঘু ছয়-সাত বছরের ব্যবধানে ছেড়া লুঙ্গি-গেঞ্জি পরিহিত এক সর্বস্বান্ত মানুষরূপে পেয়েছিল। মেঘুর এ যাবৎ কালের ইতিহাস শুনতে শুনতে উদাসীন হয়ে পড়ে লালমিঞ্‌া, "বলল, 'আমার ঘরে কাজ করবি? আমার যে ঘর নেই। আমি যে ফকির হয়েছি বাবা। খোদা যে আমাকে ছেড়ে গেছে। কী দিয়ে তোকে রাখব?" (বসু ২০০০: ৩৩)। কয়েক বছরের ব্যবধানে ব্যবসায়ী সচ্ছল লালমিঞ্‌ার ফকির বনে যাওয়ার পেছনে ছিল ভয়াবহ রোগাক্রান্ত হয়ে শয্যাশায়ী হয়ে পড়া। তাই সন্তানহীন লাল মিয়া সৎ দুই ভাইকে নিজেই খবর দিয়ে আনিয়ে গদির দেখাশোনার ভার দিয়েছিল। রক্ষক ভক্ষকের রূপ নিয়ে তার অনুপস্থিতির সুযোগে সর্বস্বান্ত করেছিল লালমিঞ্‌াকে। গদি অপবিত্র করেছিল তারা সেখানে বেশ্যা এনে তুলে। দু বছরে এক পয়সাও ঢোকেনি, বরং বের হয়েছে ঘর থেকে টাকা। পরিশ্রম, বুদ্ধি আর সততা ছিল যেই লালমিঞ্‌ার প্রধান মূলধন, সেই লালমিঞ্‌ার গদিকে অপবিত্র করে তুলতে একবারও ভাবেনি। লালমিঞ্‌ার ছত্রছায়াতেই মেঘু ধীরে ধীরে সম্প্রসারিত এক ব্যবসা গড়ে তোলে। হয়ে ওঠে লক্ষ্মণ সা'র প্রতিদ্বন্দ্বী। কিন্তু সবসময় লাল মিয়ার শিক্ষা ছিল:

> লালমিঞ্‌া বলত, শোধ নিবি অন্য রকম। সৎভাবে। পড়ে আছাড় খেলে আর তুই দাঁত বের করে হাসলি। একে বলে জানোয়ারের হাসি। নিজের চেষ্টায় উঠে দাঁড়া, দেখবি, হিংসা নিয়ে সে তোর পায়ের তলায় দাঁড়িয়ে আছে। এবার হাত বাড়া, ওকে তোল। তুলে দাঁড় করিয়ে দে। এর নাম শোধ। আর যদি দুশমন মরণ বাড় বাড়ে, তবে তোর সাচ্চাপনার আগুনে সে এমনিই পুড়ে মরে যাবে। (বসু ২০০০: ৭৩)

মেঘুর জীবনের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে তার চল্লিশোর্ধ জীবনে এসেছে ভারতবর্ষের ইতিহাসের নানা বাঁক। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রসঙ্গ এসেছে, যখন এ যুদ্ধের প্রভাবে মেঘুর ব্যবসার প্রধান কাঁচামাল ময়দা অদৃশ্য হয় বাজার থেকে। সে ভয়াবহ বিপদ থেকে লালমিঞ্‌া তাকে উদ্ধার করেছিল মৃত্যুর তিনমাস আগে। ভবিষ্যতে কখনো বিপদে পড়লে বাতলে দিয়েছিল পথ,

> যে সাহেবের কাছে তোকে নিয়ে গিয়েছিলাম, সে এক গরিব মুসলমানের ছেলে ছিল। আমি টাকা দিয়েছিলাম, তাইতে লেখাপড়া শিখে অত বড় হয়েছে। বিপদে পড়লে ওর কাছে যাস, বলে রাখলাম।' (বসু ২০০০: ৫৫)

লালমিঞ্‌ার শিক্ষা, জীবনের সর্বক্ষেত্রে মেঘনাদ পালন করার চেষ্টা করেছে। শ্বশুরবাড়িতে গিয়ে নতুন করে সবকিছু শুরু করার ক্ষেত্রেও বারবার স্মরণ করেছে লালমিঞ্‌াকে: "লাল মিঞ্‌া বলত, তুই এক শয়তান, তোর মাথার উপরে আর এক শয়তান। তারপরে ঈশ্বর। খবরদার! ভেজাল দিয়ো না।" (বসু ২০০০: ৮০)

সমাজের নীচুতলার মানুষগুলোর কাছে দেশভাগ প্রসঙ্গ রেখাপাত করে না জীবনে কোনো। তাদের কাছে দেশভাগের অর্থ হিন্দুস্থানে আবাস হবে হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের, পাকিস্তান হবে মুসলমানের। দেশভাগ হলেই দেশ যদি স্বাধীন হয় তবে বিজয়ের প্রশ্ন,

> স্বাধীনতা সবাই চায়। মানে, এই যে তোমার ইংরেজ ছেড়ে চলে যাবে বলছ, সেটা সবাই চায়। কিন্তু দেশ ভাগাভাগি হলে, ও দেশের হিন্দুরা কী করবে? সব শালা লোটা বাটি নিয়ে চলে আসবে? (বসু ২০০০: ৯৩)

দেশভাগ পূর্ববর্তী সময়ে ধর্মভেদ মানুষের কাছে গুরুত্ব পায়নি। দেশভাগ-প্রসঙ্গে বিষয়গুলো মানুষের চোখে ধরা পড়তে থাকল। এক সময়ের ডাকসাইটে ব্যবসায়ী লক্ষ্মণ সা দেশ স্বাধীন হওয়ার পর রিফিউজি হয়ে পশ্চিমবঙ্গে আবাস গড়ে তোলে। হয়ে ওঠে কাপড় ব্যবসায়ী। ব্রাহ্মণ বিনয় চৌধুরীদের মতো মানুষদের চোখে 'রিফিউজি' মানে আরও এক অন্ত্যজ শ্রেণি তারা। দেশভাগের আঁচ যতোটা না উঁচুতলার মানুষের জন্য, তার চাইতে বেশি অন্ত্যজ খেটে খাওয়া মানুষগুলোকে করল ক্ষতিগ্রস্ত:

> রিফিউজি আবার কি? বিনয় এমনভাবে বলল, যেন এক শ্রেণীর ভয়াবহ জীব আসতে আরম্ভ করেছে এ দেশে। তারপর মেঘনাদ বুঝল, সে নিজেও একজন রিফিউজি। পূর্ববঙ্গের বাস্তুহারা। রিফিউজি বলে একটি আলাদা জাত তৈরি হচ্ছে। মেঘনাদদের আর কোনও জাত নেই এখন। (বসু ২০০০: ১৫৭)

সওদাগর উপন্যাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক, মেঘনাদের সঙ্গে তার স্ত্রী লীলার সম্পর্ক। 'কালো সুন্দরী' লীলা, মনসার মতই সে অন্ত্যজ। মেঘনাদ বিয়ে করেছিল সোনাদুলি চরের মেয়ে লীলাবতী ওরফে ঝুমিকে। ভদ্র সমাজে চরের মেয়েদের দুর্নাম আছে। বিশেষ

করে বিক্রমপুরের বর্ণহিন্দুরা চরের মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক পাতাতে অনেক সময়েই অনিচ্ছুক। 'কারণ সম্ভবত, চরে যারা বাস্তু স্থাপন করে, তাদের বংশের প্রাচীনত্ব গৌরব ও অবস্থা একটা সন্দেহ জাগায়।' (বসু ২০০০: ৪৪) মেঘুর সঙ্গে যখন বিয়ে হয়, ঝুমির বয়স প্রায় উনিশ বছর। বিবাহপূর্ব জীবনে ঝুমির রয়েছে এক কালো অধ্যায়। সদ্য যৌবনপ্রাপ্ত মুদি নকুড় সা'র মেয়ে ঝুমি ধর্ষিত হয়,

> চরের ঘন সবুজ অরণ্যের মতো কালো ঝুমি। তার বলিষ্ঠ উদ্ধত দেহ, মেঘরাশির মতো চুল, তার ঔদাসীন্য, ঝড়ের মতো হাসি গোপনে বয়ে নিয়ে এল আর এক ঝড়, অদৃশ্যচারী কামার্তের বুকে। (বসু ২০০০: ৪৭)

আর দশটা নারীর মতো ঝুমির মাঝে নারীসুলভ নমনীয়তা নেই। কথাবার্তা, চলন-বলন, আচার-আচরণ সব কিছুতেই চরবাসী মানুষের মতই নেই রাখ-ঢাক। নেই কে কী ভাবল, সে চিন্তা। মেঘু-ঝুমির দাম্পত্য জীবনে মেঘুর কারখানার সবচেয়ে পুরনো কারিগর ও বড়ভাই বিপিন এক সেতু-বন্ধন। মেঘুর প্রতি ঝুমির রয়েছে এক ভয়ঙ্কর ক্ষোভ। সে স্বামীর ব্যবসার প্রতি ধ্যান-জ্ঞানকে সতীনগণ্য করে। তাই সর্বান্তকরণে সে চায় মেঘনাদের ব্যবসার ক্ষতি হোক। লীলাবতীর লীলা বোঝা দুর্বোধ্য হয়ে ওঠে বিপিনের কাছে। পাত্রাপাত্র জ্ঞান ও রুচিবোধেরও ধার ধারে না সে কথায় কিংবা আচরণে। সকলের কাছে যে মেঘনাদ সোনার মানুষ, তার প্রতি ঝুমির আক্রোশের কারণ ভাবিয়ে তোলে সকলকে। এ কি ভালোবাসার জন্য আকুতি, না কি ঘৃণা—ঝুমির সঙ্গে কথোপকথনে ভাবিয়ে তোলে বিপিনকে:

> তীব্র ঘৃণায় জ্বলে উঠে বলেছিল ঝুমি, 'বেশ্যার ঘর করো, তুমি বুঝবে কি করে? পয়সা ছাড়া আর বঞ্চনার কারণ বোঝো না। মেয়ে মানুষ পড়ে থাকবে, তোমরা এসে ঝাঁপিয়ে পড়বে তারপর ফিরে যাবে নিজের কাজে, না? কাজে যদি অত মন প্রাণ ঢেলে থাকো, তবে মেয়েমানুষ ঘরে আনার শখ কেন? ওটাও বাজারে সেরে এলেই হয়?' (বসু ২০০০: ৫২)

লীলা সব সময় স্বার্থপরের মতো চেয়েছে স্বামীর উপর সর্বান্তকরণে তার অধিকার। যে চাওয়ার ভঙ্গিটি ছিল আলাদা। কিন্তু ব্যবসা নিয়ে নিমজ্জিত মেঘনাদ তা দেয়নি, তাছাড়া তার 'প্রেমের পাঠ পড়া ছিল না'। ফলে মেঘনাদের ওপর, তার ব্যবসার ওপর এক আক্রোশে, প্রায় আত্মঘাতী ক্রোধে লীলা জ্বলেছে। এমনকি দেশভাগের সময় মেঘুর ব্যবসা লাটে উঠলে, সে ছিল নির্বিকার—

> সে বোধ হয় ভাবছিল, এবার তার গর্বিত স্বামীর অহঙ্কারের চূড়া পড়বে ভেঙে। মন্দ কী, মানুষটা একটা অমানুষিক পরিশ্রম ও ভাবনার হাত থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে যাবে। হয়তো মনটা অন্য আর একদিকে সুস্থির হয়ে বসবে। (বসু ২০০০: ৫৫)

চরজীবনে বেড়ে ওঠা লীলা স্থির হতে পারেনি। জীবনে ঘাঁটি স্থাপন তার স্বভাববিরুদ্ধ,

> নতুন প্রতিষ্ঠার কথা সে চিন্তা করে না। যাযাবরীর মতো সে শুধু পথের মোড়ে নতুন জগৎ দেখতে চায়। নতুন নতুন জগতে সে হেসে বেড়াতে চায়। যেমন চায় ওই ধলেশ্বরী, পদ্মা, মেঘনা। (বসু ২০০০: ৫৮)

বিয়ের পর থেকেই দৈহিক সম্পর্কের বাইরে মেঘনাদের সঙ্গে লীলার মানসিক বোঝাপড়া হয়ে ওঠেনি কখনো। মেঘনাদ বউয়ের প্রতি যথেষ্ট অনুরক্ত থাকলেও ঝুমির ছিল স্বামীর প্রতি অনাসক্তি। বরং আসক্ত হতে চেয়েছে সে পরপুরুষে। হতে পারে তা মেঘনাদকে আরও বেশি আকৃষ্ট করার জন্য। বিপিন, রাজীব ও পরবর্তী সময়ে রাজনীতিবিদ শিক্ষিত মার্জিত ধনী ভদ্রলোকরূপী বিনয় চৌধুরীকে সে ইঙ্গিতে সে কাছে টেনেছে। অন্য পুরুষকে আহ্বান করেছে। মেঘনাদ যখন বিনয়-রাজীবের খনন করা ফাঁদেই প্রায় সর্বস্বান্ত তখন লীলা গোপন অভিসারে তার সব গহনা দিয়েছে তাকে।

সমাজের ছোট জাতের মানুষগুলোর কাছে নমস্য এই বিনয় চৌধুরীরা। নীচুশ্রেণির মানুষের কাছে নিজে বয়সে বড় হলেও অল্পবয়সী যে কোনো ব্রাহ্মণ দেবতাতুল্য,

> একে একে তিলি সুকুমারীও প্রণাম করল। ব্রাহ্মণ নমস্য। কিন্তু অবাক হল সুকুমারী মেঘনাদকে দেখে। সে শুধু হাঁ করে দেখছে। সা'বংশের ছেলে। এমনদিনে ব্রাহ্মণের পায়ে হাত দিচ্ছে না! নকুড় হলে এতক্ষণে ব্রাহ্মণের পায়ে গড়াগড়ি দিত। (বসু ২০০০: ১৪৬)

কিন্তু এই মানুষটিকে দেবতাতুল্য জ্ঞান করে যে মানুষই আঁকড়ে ধরতে চাক না কেন, তাকে পায়ে দলতে পিছপা হয়নি বিনয় চৌধুরী:

> [...] বাবা বনাম জ্যাঠার সেই অদ্ভুত ছিঁচকেমিটা বংশানুগত কীটের মতো ঘুরছে তারও রক্তের মধ্যে। এক ইঞ্চি পাঁচিল জিতে নেওয়া কিংবা, সম্পত্তির মধ্যে শজনে গাছের দুটি ডাল হেরে যাওয়া। অথচ এই লোকগুলিই পূর্বপুরুষের কী অদ্ভুত গৌরব করত, আর বলত, ঠিক তেমনটি আবার হতে হবে এই বংশকে। পণ্ডিত হতে হবে প্রত্যেকটি ছেলেকে। (বসু ২০০০: ১৬৮)

মেঘনাদের সংসারে এসে লীলা বলেছিল, "ময়দার ড্যালার সুখ দুঃখের উদ্বৃত্তে প্রাণ ভরবে না লীলার।" (বসু ২০০০: ১৫৬)। তাই সে প্রাণ ভরাতে গিয়েছিল বিন্‌চৌ-এর কাছে। বিয়ের পর থেকে মেঘু তাকে যত গয়না দিয়েছিল তার সবকিছুই অর্পণ করেছিল বিনয়ের এক কথায়। এই বিনয়ই মেঘনাদকে সর্বস্বান্ত করার কফিনে শেষ পেরেকটি গেঁথেছিল। রাজীবকে দিয়ে মেঘনাদের ব্যবসার পারমিট বিনয়ের নামে দিল্লি থেকে করিয়ে এনেছে। এরপরই যে নসীরাম গণৎকার লক্ষ্মণ সার গদি থেকে মেঘনাদকে তাড়িয়ে ছিল, তার সঙ্গে দেখা হয়। সে এখন "বাস্তুহারা গণৎকার"। মেঘনাদকে তোষামোদ ক'রে বলে "ধনপতি সওদাগরের ভাগ্যরেখা দেখছি তোমার কপালে।" (বসু ২০০০: ১৮৬) যা বিদ্রূপের মতো শোনায়। যে বিন্‌চৌ মেঘনাদকে সর্বস্বান্ত করেছে, লীলাও তারই ফাঁদে পা দিয়েছে জেনে জীবনের এই মহাদুর্যোগের সময় মেঘনাদ নিজেকে শান্ত রাখতে পারেনি:

> দু দিন পর সে লীলার কাছে বলল, 'তোমার কাছে কোনওদিন কিছু চাইনি। তোমার সোনা আমাকে দেও, আমি ফিরিয়ে দেব আবার।'
>
> লীলা বলল, 'সে সব নেই।'
>
> : কী করেছ ?

: বিন্‌চৌকে দিয়ে দিয়েছি।

: বিন্‌চৌকে! হঠাৎ লীলাকে তুলে দলা পাকিয়ে ছুড়ে ফেলে দিল বারান্দায়। (বসু ২০০০: ১৮৮)

লীলা সব ধ্বংস করতে চেয়েছে। মেঘনাদের উপেক্ষা, তার আকর্ষণে না আসার ক্রোধে সে অন্ধ হয়েছে। মেঘনাদ ও তার ব্যবসাকে শেষ করার আয়োজন করেছে। "এ যেন নতুন ভাবে, অন্য আকারে, মনসার চাঁদ সওদাগরের পুজো পাবার জন্য ধ্বংসের আয়োজন।" (বন্দ্যোপাধ্যায় ২০১০: ৬২) লীলার ক্ষুধা-বাসনা-অভাব অকপট, বিনয়রাও পারেনি তা মেটাতে। মেঘনাদকে সামনে রেখে পরপুরুষের প্রতি এরূপ আচরণ ছোট বোন তিলিকেও কষ্ট দিয়েছে। সমালোচকের ভাষ্যে,

> এ উপন্যাসে আছে দারিদ্র্যের কারণে নারীর চারিত্রিক নৈতিক স্খলনের ছবি। অর্থের বিনিময়ে লীলা নিজের শুদ্ধতাকে পবিত্রতাকে নষ্ট করেছে। অবশেষে পতন থেকে সে নিজেকে বদলাতে চেয়েছে। তাই সে অবশেষে স্বামী মেঘনাদের কাছেই ফিরে এসেছে। (মজুমদার ২০১২: ১০৬)

অপরদিকে লীলার ছোট বোন তিলি, অন্য নাম ঠুমি, তার চব্বিশ-পঁচিশ বছরের জীবনে অবিবাহিত। গরিবের ঘরের মেয়েদের বিয়ে দিতে টাকার প্রয়োজন, যা দিতে অপারগ নকুড়, সে নিজেই সন্তান বিজয়ের মুখাপেক্ষী। তিলি সংসারে গলার কাঁটা হয়েই রয়েছে। যুবতী অনূঢ়া হওয়ায় চারদিকের পুরুষ মানুষের হাতছানি, নিজের মা সুকুমারীসহ আশপাশের বস্তিঘরের মহিলাদের কটুক্তিতে তিলি অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছে। কিন্তু দিদির মতো পরপুরুষে গা ভাসাতে চায়নি সে কখনো:

> একটু পরেই, অন্যদিকের অন্ধকার কোলে জ্বলে ওঠে বিড়ির ফুলকি। মহেন্দ্রমিস্তিরির ভাই হরেন্দ্র। বাইরে শোয় রাত্রে। সারা রাত জেগে থাকে কিনা কে জানে। তিলি যখনই বাইরে আসে, তখনই বিড়ির ফুলকি জ্বলে ওঠে। তারপর চাপা শিস কেঁপে কেঁপে ওঠে। তিলি উঠে পড়ে। (বসু ২০০০: ৯৭)

তিলি চেয়েছে ভালো একজন মানুষের সঙ্গে সংসার করতে। কিন্তু থেমে থাকেনি মানুষের বক্রোক্তি: "মহেন্দ্র মিস্তিরির বেকার ভাইটা এতক্ষণ বসে বসে সব দেখেছে। এবার হঠাৎ গেয়ে উঠল, 'তোমার সবার কাছে আনাগোনা। শুধু আমায় চেয়ে দেখ না॥'" (বসু ২০০০: ১২৫)

লজ্জার আড়াল সমাজের খেটে খাওয়া নিরন্ন মানুষগুলোর মধ্যে তেমন দেখা যায় না। সেটা তাদের পরিধেয় বস্ত্রে যেমন, মুখের ভাষাতেও অশ্লীলতার ছায়া দেখা যায়। মেঘনাদের শ্বশুরবাড়ির বস্তিজীবনে এক ঘরের ভেতর শ্বশুর-শ্বাশুরি, ছেলে-ছেলের বউ, ননদ সকলের বাস। আড়াল বলতে ঘরের মাঝে টাঙানো শাড়ি। আবার কখনো কিছুই নয়। একটি উঠোন ঘিরে পায়রার খোপের মতো ঘরগুলোর মানুষের একই চিত্র। বসার জায়গা বলতে ঘরের বাইরে এক চিলতে বারান্দা। এই একই ঘরের টিনের বেড়ার ওপাশে, টিন ঘেঁষে শুয়ে আছে তিলি। তার পাশে সুকুমারী। তাদের মাথার দিকে উলটো করে শুয়েছে নকুড়। ঘরের মাঝখানে সামান্য দু-একটা কাঠের বাক্স, বালতি,

থালা-বাসন। এক টুকরো কাপড় ঝোলানো দড়িতে। সব মিলিয়ে পার্টিশন হয়ে গেছে। পার্টিশনের ওপাশে বিজয়, বউ আর ছেলে। পায়রার খোপের জানালায় দেখা যায় বিচিত্র দৃশ্য:

> সর্বাঙ্গ উন্মুক্ত, শুধু গামছা-পরা একটি মেয়ে-মানুষ। কাঠের পাটাতনের উপর কাপড় আছড়াচ্ছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। এক একবার একটু দাঁড়াচ্ছে, হাঁপাচ্ছে। আবার আছড়াচ্ছে। খোঁপাটা ভেঙে পড়েছে ঘাড়ের কাছে। বুক দুলছে তালে তালে। কাছের বারান্দাটিতে শুয়ে আছে কয়েকজন মেয়ে আর শিশু। (বসু ২০০০: ৮৭)

লীলার কাছে মায়া-মমতা-প্রেম-ভালোবাসার দাম নেই জীবনে। সকলেই এ সংসারে যে যার স্বার্থসিদ্ধির চিন্তামগ্ন। নিজের মনের দিকে তাকানো বোকামি। সংসার জীবনের এই অপূর্ণতা মেঘনাদের ভাষ্যে,

> মেঘনাদ দূরের দিকে তাকিয়ে বলল, 'দেখো বিজয়, তোমার বিন্‌চৌ-ই বলো আর ভগবানই বলো, বউ-সোয়ামির মনের সুখে জমজমাট সংসার বড় ভাগ্যির কথা। এ সংসারে মন পাওয়া বড় দায়। মনের মিল কী চাড্ডিখানি কথা।' (বসু ২০০০: ১২৭)

বিজয় বুঝেছিল তার বোনাইয়ের লীলাকে নিয়ে আছে এক গুপ্ত দুঃখবোধ। অনাগত নতুন ব্যবসার স্বপ্নে বিভোর মেঘনাদকে তাই স্মরণ করিয়ে দিয়েছিল, সফল ব্যবসায়ী হয়ে যেন বোনকে না ভুলে যায়। প্রত্যুত্তর,

> হাসতে হাসতে, হঠাৎ ব্রেককষার মতো চাপা শব্দে থেমে, দাঁত খিঁচানো যন্ত্রের মতো বিকৃতমুখে বলল, 'ভাই তোমার দিদির কালো মুখ কোনওদিন পাইনি। যদি কালো পায়ে একটু ঠাঁই পাই, মেঘু সার তা-ই অনেক ভাগ্য।' (বসু ২০০০: ১৩১)

কলকাতায় এসেও মেঘনাদ ব্যবসা জমিয়ে তুলেছিল। কিন্তু বিনয় আর তার ম্যানেজার হরিহরের বিশ্বাসঘাতকতায় সে সর্বস্বান্ত হয়। "[...] উপন্যাসের একেবারে শেষে নতুন উত্তরণে লীলাই পেল তার ইপ্সিতকে। লৌকিক মঙ্গলকাব্যের নতুন রূপায়ণে লীলাও পাল্টায়—সেও তার ধ্বংসের তীব্র রাগ, ঘৃণা ছেড়ে আসে।" (বন্দ্যোপাধ্যায় ২০১০: ৬২) বলে, "কাজ না করে আর কতদিন থাকব।" (বসু ২০০০: ১৮৯) শূন্যতার, রিক্ততার, সর্বস্বান্ত হওয়ার মাঝখানে মেঘনাদ প্রায় শূন্যে দুলিয়ে ন্যাকড়ার পুতুলের মতো লীলাকে এনে বসাল তার মেশিনটার উপরে। তারপর নিজেও বসল মেশিনটার নীচে। নিজের মুখটা ঢাকতে চাইছে। লীলা দু হাত বাড়িয়ে দিল তার প্রকাণ্ড রুক্ষ মাথাটায়। মনে হলো এত বড় পুরুষের এমন পুজো সে আর কোনো দিন পায়নি:

> মেঘনাদের এই লীলাকে ওপরে বসানোতেই অস্পষ্ট ছায়া ফেলে যায় চাঁদ সওদাগরের মনসাকে পুজো দেওয়া, যদিও আধুনিক উপন্যাসে লৌকিক কাহিনীর রূপান্তর ঘটেছে বড় রকমের। স্বাধীন বণিকের স্বপ্নে সে বিভোর যখন বৃটিশ পরাধীনতা চলে যাচ্ছে বলে মনে হয়। বিচ্ছিন্ন একটি ব্যক্তির স্বপ্নকে এভাবেই সমরেশ বসু মেলান বৃহত্তর আর এক স্বপ্ন ও স্বপ্নভঙ্গের সঙ্গে লৌকিক পুরাণের জাগরণে। (বন্দ্যোপাধ্যায় ২০১০: ৬২)

বিনয়-রাজীবের হাতে সর্বস্বান্ত মেঘনাদের রূপকথা ব্রতকথার জগৎ ভেঙ্গে পড়ে। মেঘনাদের স্বপ্ন বিজয়ের স্বপ্ন—এই স্বপ্ন নিয়ে বিজয় মিস্তিরির সঙ্গে একাকার হয়ে যায়

মেঘনাদ। এই এক হওয়াই উপন্যাসের মূল প্রেক্ষণবিন্দু, যেখান থেকে নতুন করে যাত্রারম্ভ। সাহা বংশের ছেলে মেঘনাদ, তার ধনপতি সওদাগরের স্বপ্ন নিয়ে, কারখানার শ্রমিক হিসেবে সংগ্রামী বিজয়ের সঙ্গে একাত্ম হয়েছে। উপন্যাসের শেষাংশে বাড়ির সবাই ভাড়া বাড়ি ছেড়ে তার কারখানায় চলে আসে। আবার তন্দুর জ্বলে। নির্বাচন, ট্রেড ইউনিয়ন, সমাজনীতির চরিত্র ও চিত্র প্রায় নৈর্ব্যক্তিকভাবে সমরেশ বসু অল্প পরিসরে *সওদাগরে* তুলে ধরেছেন। সব হারিয়ে ভেঙ্গে পড়েনি মেঘনাদ, হাল ছেড়ে দেয়নি বরং শুরু করতে চেয়েছে আবার নতুনভাবে শ্রমিকের মতো করে:

> প্রত্যক্ষত *সওদাগর* রাজনৈতিক উপন্যাস নয়, কিন্তু যে অর্থে 'গোরা' বা 'গণদেবতা' বা 'ঢোঁড়াই চরিত মানস', 'ত্রিদিবা' রাজনৈতিক উপন্যাস, 'সওদাগর'ও তাই। ১৯৪৭-৪৮-এর আপাত পরিবর্তনের মধ্যে কিভাবে পূর্ববাস্তবই বজায় থাকে, সেই রাজনৈতিক রূপান্তর আসে না যাতে জীবনই রূপান্তরিত হয়, সেটিই দেখান সমরেশ বসু। (বন্দ্যোপাধ্যায় ২০১০: ৬৫)

একই উপন্যাসে কথাকার দেখিয়েছেন মেঘনাদের বঞ্চিত বাল্যকৈশোর, আবার ব্যবসায় সফলতা। সফল ব্যবসায়ী মেঘনাদের ধ্যান ও জ্ঞান হয়েছে, মস্ত বড় গদি আর কাঞ্চনমূল্য। ব্রতকথা ও রূপকথার মধ্যেই ভবিষ্যৎ জীবনের স্বপ্ন দেখেছে সে। এই ব্রতকথা ও রূপকথা আশ্রয়ী মেঘনাদ দেশবিভাগের কালো ঝড়ে নতুন বাস্তবের সম্মুখীন হয়েছে—নতুন পথে শরিক হয়েছে একদিকে লীলার ভাই বিজয়, অন্যদিকে রাজীব-বিনয়ের মত চতুর উচ্চাকাঙ্ক্ষীরা। সাম্প্রদায়িক দেশবিভাগের সময়ের পটে সমরেশ বসু দেখিয়েছেন, সাহা বাড়ির ছেলে মেঘনাদ ডুবে যায় লক্ষ্মণ সাহাদের জন্যই। আবার জীবনে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে লাল মিঞার মতো মানুষের স্নেহ-উপদেশ-পরামর্শ-সাহচর্যে। উপন্যাসের শেষেও বিনয়-রাজীব-হরিহরের ফাঁদে যখন মেঘনাদ সর্বস্বান্ত তখনও তার পাশে ছিল ইদ্রিস আলীর মতো সব হারানো মানুষ। অন্ত্যজ চালিস দেশভাগের ডামাডোলে পূর্বনাম 'রহমান' পরিবর্তন করেছিল। মেঘনাদের ভাষ্যে যে ছিল "রাস্তার ভূত" (বসু ২০০০: ৮৯), পরে হয়েছে তাঁর অন্তরঙ্গ সাকরেদ। শ্বশুরবাড়ি আসার পথে ট্রেনে লীলা আর মেঘনাদের সঙ্গে চার্লসের পরিচয়। উপন্যাসটির শেষ লাইন, "চালিস ফিরে এল, সারাদিনের বিস্কুট ফেরি শেষ করে।" (বসু ২০০০: ১৯১) সাম্প্রদায়িক হানাহানির পটভূমিতে মেঘনাদের জীবনের বাঁক পরিবর্তন বিশেষ সচেতনতার সঙ্গে দেখিয়েছেন লেখক।

সওদাগরে কেবল চিহ্নিত সংজ্ঞাবদ্ধ অন্ত্যজের আলোকে চরিত্রগুলোকে দেখা হয়নি। এক সময় যারা সমাজের বর্ণাশ্রম প্রথা অনুযায়ী উপরের সারির মানুষ ছিল, তাদের কেউ কেউ ভাগ্য বিড়ম্বনায় কিংবা সামাজিক পরিবর্তনের ধারায় নীচুতলার অন্ত্যজের কাতারে এসে দাঁড়িয়েছে। বর্ণপ্রথা বা সামাজিক অবস্থান যেটাই বলা হোক না কেন, বিষয়গুলো বর্তমান সমাজে পরিবর্তিত হয়ে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই অর্থমূল্যে বিবেচ্য হয়। যে যত বিত্তবান, আজকের সমাজে তার তত প্রতিপত্তি। কেউ জানতে চায় না, অতীতে তার কী অবস্থান ছিল। সমরেশ বসুর যে কোনো তাৎপর্যপূর্ণ উপন্যাসের মতো *সওদাগরও* বিচিত্র ব্যঞ্জনায় সমৃদ্ধ একটি উপন্যাস।

খণ্ডিতা: দ্বিখণ্ডিত স্বদেশভূমির হাহাকার

সমরেশ বসুর জীবনসায়াহ্নে রচিত *খণ্ডিতা* (১৯৮৭) উপন্যাসটি যথেষ্ট স্বাতন্ত্র্যের দাবিদার। তাঁর অন্তিমপর্বের উপন্যাসগুলোতে লেখকের শিল্পচিত্তে এক নব আলোক বিচ্ছুরণ দেখা যায়। এ সময় যেন তিনি এক নতুন বোধের জগতে বিচরণ করেছেন। *খণ্ডিতা* উপন্যাসটিতে এই ভাবনাগত আভিজাত্য উপলব্ধি করতে অসুবিধা হয় না পাঠকের। তার উপন্যাসের বিষয়গত বিবর্তনের কথা লক্ষ্য করলেও এই পরিবর্তনটি অস্পষ্ট থাকে না।

সমরেশ বসুর সাহিত্য জীবন শুরু হয়েছিল জাতীয় জীবনের একটি চরম অস্থির সময়ে—সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, দেশভাগ এবং সামাজিক অনিশ্চয়তার সময়। লেখকের প্রথম প্রকাশিত রচনা "আদাব" গল্পেও মানবিকতার এই গভীর সংকটের কথা অভিব্যক্ত হয়েছে। দেশবিভাগ এবং সাম্প্রদায়িক বিরোধ তাকে গভীরভাবে আন্দোলিত করেছে, যার ছায়া পড়েছে সাহিত্যে। *খণ্ডিতা* উপন্যাসটি ইতিহাসের এই মহাসংকটের পরিপ্রেক্ষিতেই রচিত। তাঁর প্রথম পর্বে উপন্যাসের মধ্যে যে সমাজ মনস্কতা, যে দায়বদ্ধতা লক্ষ করা যায়, শেষ পর্বের উপন্যাসে সেখানে ব্যক্তিকে আরও বৃহত্তর সমাজ পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করার প্রয়াস বর্তমান। *খণ্ডিতা* উপন্যাসে লেখক ইতিহাসের একটি জটিল সংঘাতময় সময়কে নতুনভাবে দেখলেন:

> উপন্যাসটির মূল উপজীব্য দেশবিভাগজনিত গভীর মর্মদাহ। ভারতের মানুষের চির আকাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতার ঠিক আগের দিন তিন জন তরুণ সদ্যগঠিত পূর্ব-পাকিস্তানে অর্থাৎ *খণ্ডিত স্বদেশভূমি* দেখতে যাত্রা করেছে। এঁরা যেন নতুন তীর্থের পথিক। ধর্মের ভিত্তিতে বিভক্ত নবগঠিত রাষ্ট্রকে পৃথক দেশ রূপে তারা ভাবতে আগ্রহী নয়, সেখানকার মানুষের অভিপ্রায় বা মনোভাবকে উপলব্ধি করাই এই নবযাত্রার উপলক্ষ্য। স্বাধীনতা দিবসটিতে তারা উৎসবে আনন্দে নিজের ছোট শহরে অতিবাহিত করতে রাজি নয়। (সরকার ২০০০: ২১৬)

উপন্যাসের শুরু দেশভাগের সময় উনিশশো সাতচল্লিশ সালকে ধরে। গঙ্গাতীরবর্তী রেললাইনকে কেন্দ্র করে যে বস্তিজীবন উপন্যাসে উল্লিখিত, তা ছিল না আগে। রেল লাইন হওয়ার আগে এসব অঞ্চলে ছিল গঙ্গা-তীরবর্তী গ্রাম-গঞ্জ-পল্লী। উত্তরে ছিল কাঞ্চন পল্লী। দক্ষিণে ঘুঘুডাঙ্গা। ঘুঘুডাঙ্গায় ইংরেজরা দমদমা বুলেটের কারখানা করেছিল। যেখানে ক্লাইভের একটি বাসস্থানও ছিল। সমস্ত অঞ্চলটির রয়েছে একটি ঐতিহাসিক পটভূমি। কাঁচরাপাড়া কবি ঈশ্বর গুপ্তের জন্মস্থান। নৈহাটি-কাঁটালপাড়ায় যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের রাধা-বল্লভের মন্দির প্রতিষ্ঠিত ছিল। তাঁরই এক ছেলে ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। গঙ্গার পূর্ব ও পশ্চিম পার ঘিরে যে রেল লাইন ও কারখানা তা বহু বাঙালি সম্পন্ন গ্রাম গ্রাস করে নিয়েছে। জীবন ও সময়ের প্রয়োজনে সেখানে বিস্তৃত বস্তিজীবন, বেশ্যালয়, কারখানা ও রেল লাইন। যবনিকাপাত ঘটেছে বহু বংশপরম্পরায় ধরে চর্চিত বৃত্তির বদলে স্থান করে নিয়েছে শ্রমিক ও বস্তিজীবন। এই শিল্পাঞ্চল উত্তর-চব্বিশ পরগনা ছাড়িয়ে আর বিস্তার লাভ করেনি। শিল্পাঞ্চল,

চটকল, কারখানা ঘিরে যে বস্তিজীবন, সেখানে “রন্ডি বস্তি”র (বেশ্যাদের বস্তি) অবস্থান আলাদা করে চেনা যায় না।

সতু, গোরা ও বিজু নামের তিন তরুণ খণ্ডিত দেশের উদ্দেশে যাত্রা করেছে। এই তিনজন তরুণই রাজনীতি সচেতন, সংবেদনশীল এবং সুশিক্ষিত। সাহিত্য, রাজনীতি ও শিল্প-সংস্কৃতি সম্পর্কে তারা সচেতন। বিজু প্রায় পাঁচ ফিট চার ইঞ্চি লম্বা দেহের অধিকারী ২৩ বছরের যুবক। প্রাচীন ইতিহাসে এম.এ. ফার্স্ট ক্লাস নিয়ে পাস করেছে। বিদ্বান মেধাবী ছেলে হিসেবে তার নাম ডাক আছে। বিজুর হিসেবে ১৭৫৭ সালের পলাশির যুদ্ধের পর যে পরাধীনতার সৃষ্টি হয়েছিল, এরপর ১৯৪৭ সালের ভারতের স্বাধীনতা প্রাপ্তির এই ক্ষণ। সেই হিসেবে দুশো বছরের অধীনতার সমাপ্তি। কায়স্থ শচীন্দ্রনাথ মিত্রের ছেলে বিজু। ডক্টরেট করার জন্য তৈরি হচ্ছে সে। কলকাতা ইউনিভার্সিটির অধ্যাপকদের তার প্রতি রয়েছে শুভদৃষ্টি, আবার স্থানীয় রাজনৈতিক নেতারাও বিজুকে ভালোবাসে। বিজুর রয়েছে কমিউনিস্ট পার্টির প্রতি উৎসাহ। বিজু ও গোরা বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম ডিগ্রিপ্রাপ্ত। গুজব নিয়ে তার কাজ-কারবার চব্বিশ বছর বয়সী গোরার। সতু, বিজুর বন্ধু। বিজু মাঝে মাঝে গোরাকে ‘হরু গয়লার ছেলে বলে অপমান করে। যা গোরার দুর্বলতম জায়গা। সতু, বিজু, গোরা—এই তিনজন অন্তরঙ্গ বন্ধু হলেও গোরা যে গোয়ালা হরেশচন্দ্র ঘোষের ছেলে তা তাদের যথেষ্ট প্রগতিশীলতা সত্ত্বেও মাথা থেকে সরাতে পারেনি। জাতপাতের বিচার মনের কোণে দানা বেঁধে আছে। সতু মাঝে মাঝেই ‘শুদ্দুর’ বলে ক্ষ্যাপায় গোরাকে। হরু ঘোষ চটকলের নামকরা মিস্তিরি ছিলেন। নামকরা ইঞ্জিনিয়ার যা পারতো না, সেই সব যাবতীয় বিগড়ে যাওয়া যন্ত্রকে ঠিক করে বেড়ানোই ছিল তার কাজ। অন্যান্য চটকল কোম্পানির কারখানার কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনে তাকে ধার চেয়ে পাঠাতো। গোরার দাদা গুরুদাস চটকলের মেকানিক্যাল বয় ছিল। তাদের মতো শ্রমিকদের বলা হতো মিস্তিরি বয়। অল্প বয়সে গুরুদাসের কাজের পদ্ধতি দেখে কোম্পানি কর্তৃপক্ষ তাকে ডান্ডিতে নিজেদের কারখানায় কাজ শিখতে পাঠিয়েছিল। এ মজুরদের মধ্যে প্রথম বিলেত ফেরত গোরার দাদা, এখন সে কোম্পানির চিফ মেকানিক্যাল অফিসার। থাকেন কোম্পানি অফিসারদের রাজকীয় কুঠিতে। গোরারও উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিল, তবে সে লেখাপড়ায় এগোতে পারেনি। যা পেরেছে বিজু। ডক্টরেট করার জন্য তৈরি হচ্ছে। গোরা একবার খারাপ করে আবার ইংরেজিতে এম. এ. পরীক্ষা দেবার কথা ভাবছে। “গোরাদের পরিবারে, ও প্রথম বংশধর, যে চটকলে যায়নি।” (বসু ২০০৯: ৬৩০)

সত্যেম চট্টোপাধ্যায়ের ছোট নাম সতু। স্কুল-কলেজের পাঠে অগ্রসর না হলেও স্বশিক্ষিত, সাহিত্য-শিল্পে তার প্রবল অনুরাগ রয়েছে। একজন ভাবুক, জীবন ও জগৎ সম্পর্কে তার আছে গভীর অনুসন্ধিৎসা। তার শিক্ষা প্রধানত জীবনের পাঠশালাতেই, লেখাপড়া করেনি বেশি দূর। সতু কমিউনিস্ট পার্টির মতাদর্শে বিশ্বাসী, গোরা এবং বিজু বাম মনোভাবাপন্ন, যদিও দলীয় রাজনীতির সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যোগ নেই। মুক্ত দৃষ্টিতে

পারিপার্শ্বিক ঘটনাবলিকে বিচার করার মানসিকতা তাদের আছে। সতু কায়স্থের মেয়ে প্রতিমাকে প্রেম করে বিয়ে করায় বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে বাবা-মা। এক সন্তানের জনক সতু একটি ইঞ্জিনিয়ারিং টুলস্ ফ্যাক্টরির কেরানি। সাধারণ ঘরের মেয়ে প্রতিমাকে তাড়িয়ে বেড়ায় নানা সংস্কার:

> ‘ও কী করছ?’ প্রতিমা সতুর হাত টেনে ধরেছিল। ‘ঘুমন্ত ছেলেকে চুমো খেতে নেই।’
> ‘তা বটে। ওটা একটা অলৌকিক সংস্কার ও বিশ্বাস। ঘুমন্ত সন্তানকে চুমো খাওয়া, ঘুমন্ত গুরুজনকে প্রণাম করা, মৃত্যু ও শবের প্রতীক।’ (বসু ২০০৯: ৬৫২)

শত হাসি-কান্না-অভাব-অনটনের মাঝেও সুখে-দুঃখে রয়েছে আত্মিক এক বন্ধন সতু-প্রতিমার। প্রতিমার সবসময় ভয় কাজ করে স্বামী সতুকে নিয়ে। বহির্মুখী সতু ঘর থেকে একবার বের হলে ঘরের কথা ভুলে যায়। এম. এ. পাস না করলেও কবি হিসেবে সতুর হাতযশ আছে। অল্প বয়সেই কবি হিসাবে সমকালীন প্রতিষ্ঠিত কবিদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছে। যদিও একটি কবিতার সংকলন বের করতে না পারায় বিষণ্নতায় আচ্ছন্ন থাকে তার মন:

> বিজুর ভুরু কুঁচকে উঠল। ওর গলার স্বরে বিস্ময়, ‘আজ পর্যন্ত ক’টা কবিতা লিখেছিস যে, সংকলন বেরোবে? লিখেছিস হয়তো বেশ কিছু। ছাপা হয়েছে ক’টা? টোটাল এক ডজন কবিতা কয়েকটা কাগজে বেরিয়েছে। তাতেই বিষ্ণু দে, বুদ্ধদেব বসু, লিখে তোর প্রশংসা করেছেন। এর চেয়ে বড় সৌভাগ্য আর কী হতে পারে? দু-একটা বছর যেতে দে।’ (বসু ২০০৯: ৬২০)

গোরা এদের মধ্যে কিছুটা হাল্কা স্বভাবের, লঘু বিষয়ে তার অধিক আকর্ষণ। তারা সকলেই সমকালীন রাজনীতির গতিপ্রকৃতিকে অনুধাবন করার চেষ্টা করে। সতু, বিজু, গোরাদের পাড়ার সুন্দরী বিদুষী সুধা বউদি। যার স্বামী প্রকাশদা পাগল জড়বুদ্ধিধারী এক ব্যক্তি। কোনোভাবেই প্রকাশদার সঙ্গে কী ব্যক্তিত্বে কী বংশমর্যাদায় বা আভিজাত্যে মেলানো যায় না সুধা বউদিকে:

> কী আছে ওর? টাকা? বাড়িঘর সম্পত্তি। অবিশ্যি আমি জানি, ছেলেটাই ওর সবথেকে বড় প্রাণের ধন। প্রকাশদা—আশ্চর্য! ওর মতো মেয়ের স্বামী প্রকাশদা! প্রকাশদা কি পাগল? না জড়বুদ্ধি? মানুষটা শান্ত। স্বামী হিসেবে প্রকাশদার যোগ্যতা কী, কে জানে। (বসু ২০০৯: ৬৩২)

গোরার থেকে বছর ছয়ের বড় সুধা বউদির সঙ্গে গোরার রয়েছে এক অসমবয়সী অনৈতিক সম্পর্ক। যে সম্পর্কের সূত্রপাত সুধা বউদির ছেলেকে পড়ানোর সুবাদে:

> ও সুধা বউদির সাত বছরের ছেলেকে সন্ধ্যায় পড়াতে যায়। দু বছর আগে, সপ্তাহে দু দিন পড়াতে যেত। ছেলের বয়স তখন পাঁচ ছিল। দিনগুলো বাড়তে বাড়তে, এখন প্রতিদিন যায়। ও সতু আর বিজুকে জিজ্ঞেস করেছে, ওরা কি শহরের লোকের মতো খারাপ কিছু ভাবে? (বসু ২০০৯: ৬৩২)

তিন বন্ধুর আলোচনার মধ্য দিয়ে সমকালীন রাজনৈতিক পরিবেশটি পাঠকের সামনে এনেছেন লেখক—

ছেচল্লিশের দাঙ্গা, ডাইরেক্ট অ্যাকশনের কথা, তৎকালীন কংগ্রেস, মুসলিম লীগ নেতাদের কূটনৈতিক কার্যকলাপ এবং কমিউনিস্ট পার্টির নেতাদের মনোভাব সম্পর্কে এরা মুক্তমনে বিচার-বিশ্লেষণ করে। ফজলুল হক, নাজিমুদ্দিন, শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, শরৎ বসু প্রমুখ নেতাদের প্রসঙ্গ নিয়ে তাদের আলোচনা হয়। সবার অন্তরে গভীর শ্রদ্ধা মহাত্মা গান্ধির প্রতি। (সরকার ২০০০: ২১৬-২২৪)

মানবতা, অহিংসার পূজারী গান্ধিজী। প্রসঙ্গত এসেছে ব্রিটিশ শাসকের বিভেদনীতি, হিন্দু-মুসলমান বিরোধ, জিন্নার দ্বিজাতিতত্ত্ব, "[...] হিন্দুদের কাছে আমরা ছোট, নীচ, নোকর। আমরা ভারতের মোছলমানরা হিন্দুর থেইকা আলাদা জাত। এমুন কী পশ্চিমা মোছলমানদের থেইক্যাও আমরা আলাদা।" (বসু ২০০৯: ৬৯০) সমরেশ বসুর নিজ ভাষ্যে উঠে এসেছে যে, তিনি প্রথম গান্ধি প্রসঙ্গ এনেছেন *খণ্ডিতায়* (বন্দ্যোপাধ্যায় ২০১০: ১১১)। সমগ্র পরিবেশ যেখানে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষে তপ্ত, সেখানে এরা বিশেষত সতু মানসিক আশ্রয় নিতে চায় গান্ধিজীর কাছে। "সমগ্র দেশ আমার" গান্ধিজীর এই বাণী তাদের চিত্তে সেই গহন অন্ধকারে আলোর ইঙ্গিত দেয়। তাদের অন্তরে বিশ্বাস জাগায়, নতুন চেতনায় আলোকিত করে। সন্দেহ, অবিশ্বাস, নৈরাশ্যকে জয় করে আশা ও বিশ্বাসে আত্মপ্রত্যয়ী হবার জন্য সচেষ্ট হয় তারা। সতু অনুভব করে যে বামপন্থী বন্ধুরা গান্ধি-জিন্নাহ মিলনের স্লোগান দিয়ে আকাশ বাতাস মুখরিত করেছিলেন, তারাও আজ বিষণ্ণতা আড়াল করতে পারছেন না। তার মনে চিন্তা জাগে আগামীকাল স্বাধীনতা দিবস ভবিষ্যতের জন্য কোনো অশুভ সংকেত বহন করে আনবে কিনা!

দেশ স্বাধীন হওয়ার আনন্দে সতু-বিজুরা যখন আনন্দে আটখানা তখন গঙ্গায় জেলেরা আপন মনে মাছ ধরে চলেছে, "সেইজন্যই তো বলছিলাম, 'দেশ স্বাধীন হওয়ার খুশিতে সবাই মশগুল। আর ওরা আপন মনে মাছ ধরছে।' সতুর চোখ আবার গঙ্গার বুকে, 'ওদের প্রাণে কি ফুর্তি নেই?'" (বসু ২০০৯: ৬২০) খেটে খাওয়া মানুষগুলোর জগতের উত্থান-পতনে কিছু যায় আসে না। যাদের দিনের শুরু ও শেষ হয় ক্ষুধানিবৃত্তির ভাবনায়, তাদের কাছে রাজনৈতিক বিষয়-আশয় কোনো প্রভাব ফেলে না। একটি দিনের শেষে পরবর্তী দিনটিতে কীভাবে আবার অন্নসংস্থান হবে, সেটাই তাদের তাড়িত করে। দেশ স্বাধীন কি দ্বিখণ্ডিত, তাতে তাদের জীবনাচরণে কোনো রেখাপাত করে না।

সতু, বিজু এবং গোরার পূর্ব পাকিস্তানের সৈয়দপুর যাত্রাকালে ট্রেনের বিচিত্র মানুষের সঙ্গে তাদের আলাপ পরিচয়ের মাধ্যমে সেই সময়কার সাধারণ হিন্দু-মুসলমান নানা শ্রেণির মানুষের মনের ভাবনা তুলে ধরেছেন লেখক। পূর্ব পাকিস্তানে কোনো কোনো স্থানে গোলমাল হচ্ছে, লুটপাট হচ্ছে; তাই তিন বন্ধুর মধ্যে কারো কারো মনে একটা আশংকা জাগছে। কিন্তু তারুণ্যের উন্মাদনায় এসব আশংকাকে তারা সরিয়ে রাখে একটি রোমাঞ্চকর অভিযানের আগ্রহে, যদিও তারা জেনেছে নতুন রাষ্ট্র পেয়ে পূর্ব পাকিস্তানের

সাধারণ মানুষ এখন আনন্দে মেতে আছে। চলন্ত ট্রেন গতিশীল জীবনের ছবি। এই সব বিচিত্র মানুষের মধ্যেই তারা জীবনের বিচিত্র রূপের দেখা পায়। সাম্প্রদায়িক, ফন্দিবাজ, হিংসুটে ব্যক্তির সঙ্গে সাক্ষাৎ যেমন বিরক্তি জাগায় তেমনি নিষ্ঠাবান অসাম্প্রদায়িক মুসলমান সৈয়দ বদরুদ্দিন ইসলামের মতো মানুষের সাহচর্যে মানুষেরই আর একটি আদর্শবান রূপের পরিচয় লাভ করে। দেশ স্বাধীন হওয়ার আনন্দে উচ্ছল কেউ, অপরদিকে দেশভাগ হওয়ার দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয় কারো। স্বাধীন ভারতের মুসলমানদের গাড়ি ভর্তি করে পাঠিয়ে দেয়া হয় পূর্ব-পাকিস্তান। বাপ-দাদার ভিটে ছেড়ে নিরাশ্রয় মুসলমানরা পাড়ি জমায় অজানা অচেনা এক দেশে, যাদের অনেকেই কলকাতার ধ্বংসপ্রাপ্ত বস্তির নিরাশ্রয় বাসিন্দা:

> এরা কি জানে না, কলকাতায় আজ হিন্দু-মুসলমান হাতে হাত মিলিয়ে পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। হিন্দু-মুসলিম ভাই ভাই শ্লোগানে কলকাতার আকাশ বাতাস মুখরিত। অবিশ্যি এখানে তা ভেসে আসছে না। কিন্তু ওরা যখন পূর্ব পাকিস্তানে পৌঁছুবে, তখন এরা কী রূপ ধারণ করবে? সতু গতকালই বলেছিল, 'এদের চোয়াল কি নরম থাকবে?' (বসু ২০০৯: ৬৫৩)

অপরদিকে নদিয়া, মুর্শিদাবাদের মতো মুসলমান জনবহুল অংশগুলো, হিন্দুস্তানের অংশ বলে সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছে, "নদিয়ার ডিষ্ট্রিক ম্যাজিস্ট্রেট এখনও হিন্দুদের ওপর পাইকারি জরিমানা চালিয়ে যাচ্ছে। মুর্শিদাবাদ ইন্ডিয়াতে থাকার কথা। এখানে খবর পৌঁছেছে, মুর্শিদাবাদে পাকিস্তানের ফ্ল্যাগ উড়ছে।" (বসু ২০০৯: ৬৫৩)। এমনই আরো সংকটে পড়ে সাধারণ মানুষেরা। তাদেরই একজন, কাঞ্চনা বিজুর ছোট বোন। দেশভাগ প্রসঙ্গে সতু-বিজুর মধ্যে তুমুল আলোচনা শুনে সরল কাঞ্চনার প্রশ্ন, "বাব্বা! আপনারা সব কথাই এমন করে বলেন, কিছু বলতেই ভয় করে। আসলে খুলনার আশাশুনিতে আমাদের মামাবাড়ি তো! পাকিস্তান হয়ে গেলে আর মামাবাড়ি যাব কেমন করে?" (বসু ২০০৯: ৬৩৭)

উপন্যাসের মূল কাহিনীর সঙ্গে যুক্ত করেছেন লেখক হাত কাটা উদ্যত যৌবনা এক নারীকে। হিন্দু-মুসলমান সব সম্প্রদায়ের পুরুষ তার রূপে আকর্ষিত হয়েছে। লেখক তেইশ বছর বয়সে সৈয়দপুর বেড়াতে গিয়ে এই রকম একটি অপরাধী শিবিরে যাযাবর শ্রেণির একটি নষ্ট মেয়ের সাক্ষাৎ পান। সমরেশ বসুর অন্তরঙ্গ বন্ধু সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়কে লেখা একটি চিঠিতে এই মেয়েটির উল্লেখ আছে। তিনি লিখেছেন:

> আমার অনেক দিনের ইচ্ছা একটি উপন্যাস লেখার। ঘটনাটি বাস্তব। ১৯৪৭-এর ১৫ই আগষ্ট সন্ধ্যাবেলা North Bengal Express-এ আমি ও দুজন বন্ধু, পশ্চিমবঙ্গ নৈহাটি থেকে পূর্ব পাকিস্তান দর্শনে গিয়েছিলাম। [...] সেখানে দেখা পাই এক উদ্ধত যৌবনা নষ্ট নারীর— যার বাঁ হাতটি মণিবন্ধ থেকে কাটা। তাকে নিয়ে হিন্দু মুসলমান সকলেরই দুরন্ত লোভ। মেয়েটি নষ্ট নট সেটেলমেন্টে থাকে—তার বাইরে আসার অনুমতি ছিল। (বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯৮৮: ৪০)

উপন্যাসেও North Bengal Express-এ করেই সতু-বিজু-গোরা পূর্ব পাকিস্তানে আসে। নট সেটেলমেন্টের মোতি চরিত্রটি এই উপন্যাসের সেই নষ্ট মেয়েটির

সাহিত্যিক রূপ। যাকে লেখক সর্বংসহা বসুন্ধরার প্রতিমূর্তি রূপে সৃষ্টি করেছেন। “উন্নত নাসা, প্রতিমার মতোই আকর্ণবিস্তৃত আয়ত চোখ। [...] সুগঠিত সুন্দর স্বাস্থ্য, অথচ তাকে দেখাচ্ছে অগ্নিশিখার মতো।” (বসু ২০০৯: ৬৭৮) এই মোতিকেই লেখক দেখিয়েছেন খণ্ডিতা দেশমাতৃকার প্রতীকরূপে। (বসু ২০০৯: ৬৭৯)। সতুর কথার মধ্য দিয়েই মোতির মাধ্যমে খণ্ডিত স্বদেশভূমিকে রূপক দিয়েছেন লেখক, “তুমি জমিন। তোমার ভাগ সকলে চায়।” (বসু ২০০৯: ৬৯২)। পূর্ব বাংলার সৈয়দপুরের নট সেটেলমেন্টের মেয়ে মোতি। “সেটেলমেন্ট—এইটারে আপনি কলোনি বা উপনিবেশ কইতে পারেন। তবে, আসলে একরকমের জেলখানাই বলা যায়।” (বসু ২০০৯: ৬৭৯)। তারা এক শ্রেণির যাযাবর। নানা রকম সার্কাসের খেলা জানে। ম্যাজিক শেখায়। মাদুলি, কবচ, ওষুধ দেয়। আসলে এরা নাকি চুরি-ডাকাতি করে। কজির কাছ থেকে কাটা মোতির বাঁ হাতটা, “মোতি বলে, ওর তখন পাঁচ বছর বয়স ছিল। ওদেরই একজন চুরি করে পালিয়ে গেছল, আর ওকে ধরে, গ্রামের লোকেরা হাত কেটে দিয়েছে।” চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়েছিল বলে গ্রামের লোকেরা কাটারি দিয়ে হাতটা কেটে দিয়েছিল। তবে এখনো মোতি যা হাত সাফাই জানে তা অনেককেই হার মানায়। নিজেদের মধ্যে কেউ কেউ সংকেতের মতো কথা বলে মারাঠি আর গুজরাটি ল্যাঙ্গুয়েজে। সেটেলমেন্টের মানুষেরা:

> নানান রকম কাজ করে। দড়ি পাকায়, পাপোশ, পাটি, মাদুর বোনে। তালপাতার পাখা বানায়। চরকায় সুতো কাটে। অনেকে তাঁতও চালাতে শিখেছে। গভর্নমেন্ট বাইরে থেকে রঙিন সুতো সাপ্লাই দেয়। ওরা গামছা, মোটা রঙিন শাড়ি, চাদর সবই বোনে। তার মানে, ওরা নিজেদের রুটি নিজেরাই কামায়। বাইরে বেরোতে পারে না। জেলখানার মতোই। তবে শুনলেই তো, পুরুষ আর মেয়েদের মধ্যে বিশ্বাসী কয়েকজনকে বাইরে বেরোতে দেওয়া হয়। কেউ যে পালিয়ে যায় না, তা খুব কম। ধরা পড়লে বছরের পর বছর পায়ে বেড়ি। কাজও বেশি করানো হয়। (বসু ২০০৯: ৬৮১)

পাহারা ঘেরা উপনিবেশের বাসিন্দা মোতিদের কোনো জাত নেই, নেই কোনো ধর্ম। তাই সমাজের বংশমর্যাদা সম্পন্ন আত্মপরিচয় বহনকারী মানুষগুলোর উপর রয়েছে নট সেটেলমেন্টের বন্দি মানুষগুলোর চাপা ক্ষোভ:

> আমার নানা কয়, এই জগতের মানুষরা একদিন বড় আগুন জ্বালাইবে। সেই আগুনে আমরা ভাত রান্দুম। শীতে আগুন পোয়ামু। কিন্তু বন্ধু, তোমারে দেইখা তো নানার কথা বিশ্বাস হয় না। আমার নানা জানে না, পৃথিবীতে তোমার মতন মানুষও আছে। মোতি সতুর মাথা ওর অনম্র উর্বশী বুকে টেনে নিল। (বসু ২০০৯: ৬৯২)

উপন্যাসের শেষে নট সেটেলমেন্টের কুহকিনী মোতির সঙ্গে শ্রেণিবিপ্লবের কাণ্ডারী সতু এক সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে। আপাতদৃষ্টিতে এক কসবি মোতি, যার দেহই সকলের আরাধ্য বিষয়। কিন্তু অন্তরালে রয়ে যায় এই মানুষগুলোর চাওয়া-পাওয়া। সতু-মোতির সম্পর্কের সূত্রে লেখক প্রকাশ করেছেন এই মানুষগুলোর অজানা দুঃখ-কষ্টকে:

“আমরা না মোছলমান, না হিন্দু।” রক্তে আগুন ধরানো হাসি মোতির বাঁশির স্বরে বেজে উঠল,

> মা কালী ভজি, পিরেরেও ভজি। রুদ্রাক্ষ পরি, তসবিও পরি। গোরু খাই, শুয়োর খাই। আমারে হিন্দুও খায়, মোছলমানেও খায়। আমি জমিন। জমিন সবাই চায়। সবাই চষে। জমিন লইয়া খুনাখুনি করে। (বসু ২০০৯: ৬৮৭)।

সতুর মোতির দেহের চাইতে তার মনের অজানা কোণের দুঃখ-কষ্ট, ভালোবাসার প্রতিই মোহিত হয়েছে। সতু তার মধ্যেই মহিমান্বিতা মাতৃরূপকে প্রত্যক্ষ করে আনন্দে-বিষাদে-বিস্ময়ে আভিভূত হয়। অন্তরের শ্রদ্ধা তার চরণে নিবেদন করে। মোতির কথা, “বন্ধু, এই কাটা জমিনে তুমি সালাম কর, একটু ভালবাসবা না?” (বসু ২০০৯: ৬৯২)। সতু বলে, “তুমি আমার চিরদিনের ভালবাসা [...] তোমার জাত নেই, তুমি জমিন। এই কাটা জমিনই আমার ভালবাসা।” (বসু ২০০৯: ৬৯২) খণ্ডিত স্বদেশভূমির কণ্ঠে যেন কান্নার সুর ধ্বনিত হয়, “আর কি কোনও দিন এই কাটা জমিনে আসবা?” (বসু ২০০৯: ৬৯২)। গভীর বিচ্ছেদের যন্ত্রণায় সতু উচ্চারণ করে—“আসব চিরকাল আসব, [...] এই জমিনেই যেন আমি চিরকাল জন্মাই।” (বসু ২০০৯: ৬৯২)। এই বিচ্ছেদই শেষ কথা নয়, অন্তরের গভীরে এক অখণ্ড মহিমা চিরকাল অনাহূত থাকবে, বিচ্ছেদের চিত্তদীর্ণ ব্যাকুলতার মধ্যেই মিলনের প্রতিশ্রুতি নিহিত আছে।

এক ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি ও আশাবাদের মধ্য দিয়েই উপন্যাসটি সমাপ্ত হয়েছে। *খণ্ডিতা* উপন্যাসটিতে আত্মজৈবনিক উপন্যাসের ছায়া আছে। সম্ভবত এই উপন্যাসেই লেখকের ব্যক্তিজীবনের অনেক উপাদান কাহিনীর কায়া গঠনে সাহায্য করেছে। উপন্যাসের নায়ক সতুর উপর লেখকের ছায়া দেখা যায়। সমরেশ বসু ও সতু দুটি চরিত্রকে একাত্ম মনে হয়। সতুর স্ত্রী প্রতিমার মধ্যে গৌরী বসুকে বা তারক বাবুর মধ্যে সত্যপ্রসন্ন দাশগুপ্তকে অনুভব করতে অসুবিধা হয় না। অবশ্য তেইশ বছরের সমরেশ বাবুর সঙ্গে তেষট্টি বছরের সমরেশ বসুর ভাবনা যুক্ত হয়েই সতু চরিত্রটি নির্মিত। বিবরণধর্মী এ জাতীয় উপন্যাসে লেখকের অভিজ্ঞতা, চিন্তাধারা অনায়াসে স্থান করে নিতে পেরেছে:

> *খণ্ডিতা* উপন্যাসের বিষয়গত মহিমা অসাধারণ, প্রেক্ষিতটিও বৃহৎ; কিন্তু বিষয়ের মহত্ত্বের কারণে নয়, শিল্পমহিমার কারণেই উপন্যাস কালজয়ী সৃষ্টি হিসাবে গণ্য হয়। *খণ্ডিতা* উপন্যাস সেই বিচারে অসামান্য হয়ে উঠতে পেরেছে কিনা সংশয় জাগে। তবে উপন্যাসের বিষয় নির্বাচনে সমরেশ বসু জাগ্রত মানসিকতার পরিচয় দিতে পেরেছেন। ইতিহাস চেতনার গভীরতার সঙ্গে তাঁর অন্বেষকের দায়িত্ববোধও কম নয়। (সরকার ২০০০: ২২৪)

উপন্যাসের কেন্দ্রীয় ভাবনা—খণ্ডিত স্বদেশভূমির জন্য গভীর বেদনাবোধ। গান্ধিজীর মতো সতু বিশ্বাস করে দ্বিখণ্ডিত স্বদেশভূমি তার নয়, “সমগ্র দেশ আমার”। সতু যখন মোতির কাটা হাতের ছিন্ন শেষাংশ স্পর্শ করে প্রশ্ন করে এই হাত কারা কেটেছে? মোতির উত্তর, “জানি না, হিন্দু হইতে পারে মোছলমান হইতে পারে।” (বসু ২০০৯:

৬৮৭) সতুর মনেও প্রশ্ন জাগেনি, দেশকে কারা দ্বিখণ্ডিত করল? হিন্দু না মুসলমান সেটা বড় কথা নয়—তার কাছে দেশ অখণ্ড। তার স্বদেশ চিরদিন অখণ্ডই থাকবে, স্বপ্নে ও ভালোবাসায়। মোতির খণ্ডিত হাতের চিত্রকল্পে লেখক দেখাতে চেয়েছেন দ্বিখণ্ডিত স্বদেশভূমিকে।

বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ইংরেজ শাসনের অবসানে উপমহাদেশ হয় দ্বিখণ্ডিত। ১৯৪৭-এর ভারত বিভাগের সঙ্গে হাজার বছরের ঐতিহ্যমণ্ডিত অভিন্ন নৃতাত্ত্বিক পরিচয়ের বাঙালি জনগোষ্ঠীরও বিভাজন ঘটে। এ বিভাজন ছিল সম্প্রদায়গত ভিন্নতার সূত্রে। বাঙালির জীবনে এই বাংলা বিভাগের প্রতিক্রিয়া বেদনাবহ ও সুদূরপ্রসারী। উপর্যুক্ত উপন্যাসগুলোতে লেখক সমরেশ বসুর দৃষ্টিতে ভাগ্যবিড়ম্বিত ছিন্নমূল কিংবা নিজভূমে পরবাসী মানুষের হাহাকারের দৃশ্যায়ন ঘটেছে। একই সঙ্গে অভিব্যঞ্জিত হয়েছে বাস্তুহারা হওয়ার পরিণামে বিবিধ প্রতিক্রিয়া।

তথ্যসূত্র

গুপ্ত, বিজয় (১৯৬২)। *পদ্মাপুরাণ*, (সম্পাদনা: জয়ন্তকুমার দাশগুপ্ত), কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা।

গোস্বামী, সত্রাজিৎ (২০১৬)। *বঙ্গীয় লোকসংস্কৃতি কোষ*, (সম্পাদক: বরুণকুমার চক্রবর্তী ও অন্যান্য), তৃতীয় সংস্করণ, দে বুক স্টোর, কলকাতা।

ঘোষ, সাগরময়, সম্পাদক: *দেশ*, 'নিজেকে জানার জন্য', সমরেশ বসু বিশেষ সংখ্যা (১৯৮৮), কলকাতা।

চৌধুরী, সত্যজিৎ (১৯৯৪)। *সমরেশ বসু: স্মরণ সমীক্ষণ*, (সম্পাদক: সত্যজিৎ চৌধুরী, নিখিলেশ্বর সেনগুপ্ত ও বিজলি সরকার), চয়নিকা, কলকাতা।

বন্দ্যোপাধ্যায়, পার্থপ্রতিম (২০১০)। *সমরেশ বসু: সময়ের চিহ্ন*, দ্বিতীয় সংস্করণ, প্রকাশ ভবন, কলকাতা।

বন্দ্যোপাধ্যায়, সরোজ (১৯৮৮)। 'জীবন ও শিল্পের যুগলবন্দী', *দেশ*, (সম্পাদক: সাগরময় ঘোষ), সমরেশ বসু বিশেষ সংখ্যা, ৫৫ বর্ষ ২৮ সংখ্যা, কলকাতা।

বন্দ্যোপাধ্যায়, হরিচরণ (১৯৬৬)। বঙ্গীয় শব্দকোষ প্রথম খণ্ড, (সম্পাদক: হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়), সাহিত্য আকাদেমি, দিল্লী।

বসু, সমরেশ রচনাবলী ২ (২০০০), (সম্পাদক: সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়), দ্বিতীয় মুদ্রণ, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা।

বসু, সমরেশ রচনাবলী ২ (২০০০), 'ভূমিকা' (সম্পাদক: সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়), দ্বিতীয় মুদ্রণ, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা।

বসু, সমরেশ রচনাবলী ১৩ (২০০৯), (সম্পাদক: সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়), আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা।

বসু, সমরেশ: আমাদের বাস্তব (২০১৩), একুশ শতক, কলকাতা।

বসু, নিতাই (১৯৮৯)। 'সমরেশ বসুর একান্ত সাক্ষাৎকার', *আমার আয়নার মুখ*, (সম্পাদনা: নিতাই বসু), মৌসুমী প্রকাশনী, কলকাতা।

বসু, সমরেশ (১৯৮৮)। 'প্রসঙ্গ ভারতীয় কমিউনিস্ট (অখণ্ড) পার্টি ও আমি', সম্পাদক: সাগরময় ঘোষ, *দেশ*, কম্যুনিজম সংখ্যা, নভেম্বর, কলকাতা।

বিশ্বাস, শৈলেন্দ্র (২০০৫)। *সংসদ বাংলা অভিধান*, (সম্পাদক: শৈলেন্দ্র বিশ্বাস), পঞ্চম সংস্করণ, সাহিত্য সংসদ, কলকাতা।

ভট্টাচার্য, হংসনারায়ণ (১৯৮০)। *হিন্দুদের দেবদেবী উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ তৃতীয় পর্ব*, ফার্মা কেএলএম (প্রাইভেট) লিমিটেড, কলিকাতা।

মজুমদার, সঙ্গীতা (২০১২)। *দুই দশকের বাংলা উপন্যাস (১৯৫০-১৯৭০)*, গাঙচিল, কলকাতা।

মুখোপাধ্যায়, অরুণকুমার (২০০২)। *মধ্যাহ্ন থেকে সায়াহ্নে বিংশ শতাব্দীর বাংলা উপন্যাস*, দ্বিতীয় সংস্করণ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা।

রায়, যতীন্দ্রনাথ (২০১৬)। *বঙ্গীয় লোকসংস্কৃতি কোষ*, (সম্পাদক: বরুণকুমার চক্রবর্তী), দে বুক স্টোর, কলকাতা।

সরকার, অশোক (২০০০)। 'খণ্ডিতা', *এবং জলার্ক*, (সম্পাদনা : স্বপন দাসাধিকারী), সমরেশ বসু বিশেষ সংখ্যা ১, পুস্তক বিপণি, কলকাতা।

সরকার, তারক (২০০৯)। *বাংলা উপন্যাসে দেশভাগ ও দেশত্যাগ*, অরুণা প্রিন্টার্স, কলকাতা।